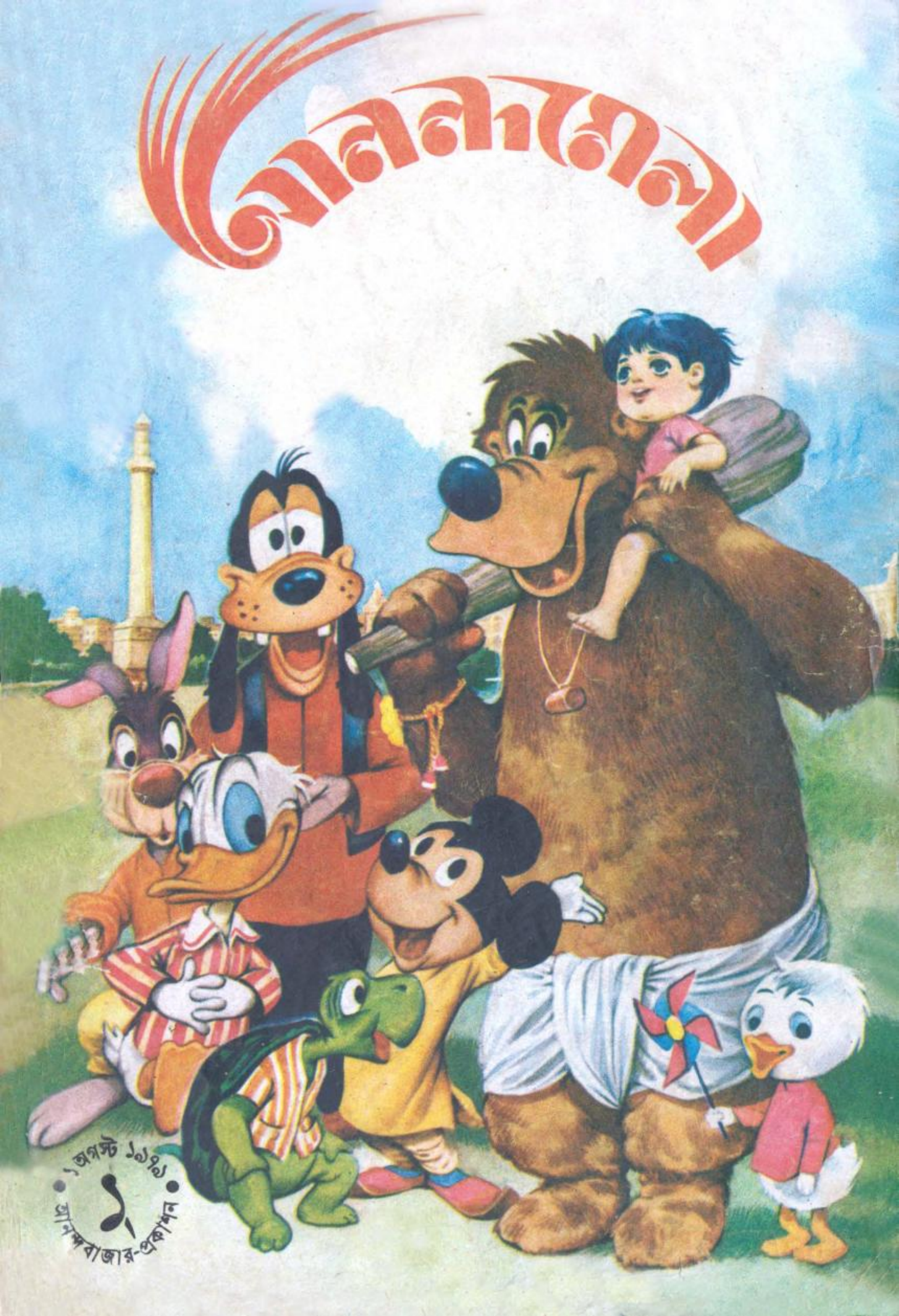
আনন্দমেলা
১ অগস্ট ১৯৭৯
১
আনন্দবাজার-প্রকাশন

ওর কাছেই আমাদের
জুতো তৈরির হাতেখড়ি

শুনে হয়তো অবাক হবেন, যে ঐ ছোট্ট শিশুর কাছেই বাটা অনেক কিছু জেনেছে, শিখেছে।

যেমন শিশুর জুতো তৈরি হবে শিশুর পা'কে অনুসরণ ক'রে। জুতো হবে নরম তুলতুলে, যাতে ব্যথার ছোঁয়াচও না লাগে। সুন্দর 'ফিট' হবে যাতে পরে শিশু পায় পুরোপুরি আরাম। সেই সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে তার বাড়ন্ত পায়ের কথা।

এছাড়াও আছে সুন্দর সুন্দর রঙ, সুন্দর সুন্দর নক্সা। এ সব কথা চিন্তা করে তবেই আমরা ছোট্ট শিশুদের জন্য আমাদের মনোরম, বাহারী জুতো তৈরি করি।

আজ এই আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে,
ভারত ও বিশ্বের ঐসব শিশু
বিশেষজ্ঞদের আমরা আমাদের
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

Bata

শুধু সেরা জুতোই নয়,
আরো অনেক বেশী

আনন্দমেলা

১৬ শ্রাবণ ১৩৮৬ • ১ অগস্ট ১৯৭৯ • ৫ বর্ষ • ৫ সংখ্যা

গল্প

ডাক্তারের কুকুর ডাক্তার। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ১০
বুদ্ধিমতী মেয়ে। আরতি দাস ৪৩
হস্টেলে সুমন। শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫

ইতিহাসের গল্প

সাদা হাতের থাবা। প্রসিত রায়চৌধুরী ৫৭

বিশেষ রচনা

রূপকথার জগতে। রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৪
শান্তিনিকেতন থেকে ...। অপর্ণা ভট্টাচার্য ৩১

ধারাবাহিক উপন্যাস

পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৫
ভুতুড়ে কুকুর। আশাপূর্ণা দেবী ৩৮

আত্মকথা

খেলতে-খেলতে। চুনী গোস্বামী ২৭

ছড়া

কলকাতাতে বান। বিমল ঘোষ (মৌমাছি) ৩৬
জানার বিষয়। রঞ্জন ভাদুড়ী ৩৭
উড়ুটি। মৃণালকান্তি দাশ ৪২

চিত্রকাহিনী ও কমিকস

সদাশিব ১৯, রোভার্সের রয় ২০, টিনটিন ২২
বিশ্বকাপ ২৪, গোয়েন্দা বাজ ২৫, টারজান ২৬
বাঘা ৪৬, গাবলু ৬০

খেলাধুলো

খাবাজি-সানজারি। অলোক দাশগুপ্ত ৫০
কোথায় সেই লড়াই। শ্যামসুন্দর ঘোষ ৫২
ভারতীয় হকির শনির দশা। বজ্রসেন ৫৩

লেখাপড়া

ভাণ্ডার খেলা। কুন্তক ৪৮
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৪৯
ওরিয়েন্টাল সেমিনারি। আনন্দ বাগচী ৬২

অন্যান্য আকর্ষণ

ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, ছবির মজা ৪৫, নদনদী ৫৯
তোমাদের পাতা ৬৪, আঁকো-শেখো ৬৬

প্রচ্ছদ বিমল দাস

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদল বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

গোয়েন্দা ফেলুদা'—এই নামটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব বেশিদিনের নয়। মাত্র দশ বারো বছর। এক আংটি চুরির রহস্যের জট খুলতে বাংলা সাহিত্যে নতুন এক গোয়েন্দাকে আমদানি করলেন সত্যজিৎ রায়। সেই গোয়েন্দার নাম প্রদোষ মিত্তির ওরফে ফেলুদা।
বাদশাহী আংটির রহস্য উদ্‌ঘাটনের পর একের-পর-এক কত-না রহস্যের জট খুললেন ফেলুদা। কখনো গ্যাংটকে, কখনো রাজস্থানে, কখনো আসামে, কখনো বেনারসে, কখনো বোম্বাইতে, কখনো বা বাড়ির পাশে পার্ক স্ট্রীটের কবরখানায় ছুটে গেছেন ফেলুদা রহস্যের কিনারা করতে। ইতিমধ্যে আবার আরেকজন জুটেছেন ফেলুদা আর তোপসের নিত্য সহচর হয়ে। তাঁর নাম লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু, বিখ্যাত রহস্য-গল্প-লেখক।
জটায়ু এসে জুটে যাওয়ায় রহস্যের সঙ্গে কৌতুকের এক আশ্চর্য মিলন ঘটেছে ফেলুদা-কাহিনীতে। এখন এই তিনজনের নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে সব-বয়সী পাঠক একেবারে উন্মুখ হয়ে থাকেন।

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

বাদশাহী আংটি ৫.০০ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৬.০০ সোনার কেল্লা ৬.০০ বাক্স রহস্য ৫.০০ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৬.০০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫.০০ জয় বাবা ফেলুনাথ ৬.০০ ফেলুদা এণ্ড কোং ৮.০০ গোরস্থানে সাবধান ৮.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

রূপকথার জগতে

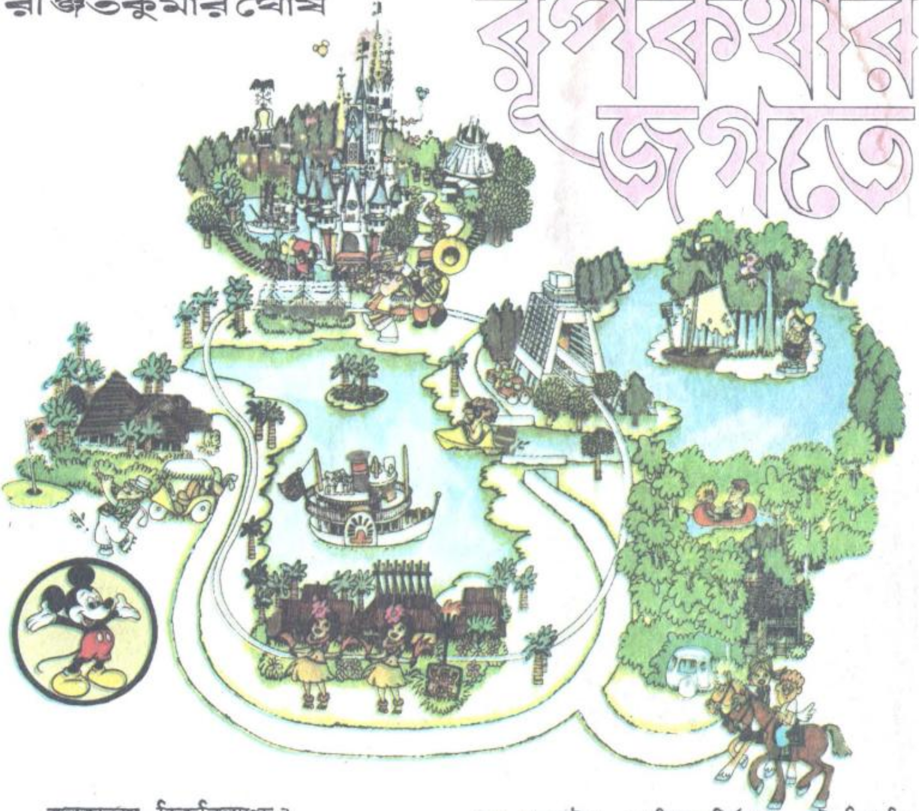

কলকাতায় ডিজনিল্যাণ্ড ?

হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই হওয়ার কথা। অবশ্য এখন পর্যন্ত জায়গা খোঁজাখুঁজি চলছে, এক হাজার একর জায়গা পাওয়া তো আর সহজ কথা নয়। কিন্তু এ-ব্যাপারে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী আগ্রহী। তিনি কে কে বিড়লাকে আশ্বাসও দিয়েছেন যে, রাজ্য সরকার জমি খুঁজে দিতে চেষ্টা করবেন। লবণ হ্রদের নাম শোনা যাচ্ছে এ-প্রসঙ্গে। কে কে বিড়লা যে প্রকল্পটি মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েছেন, তাতে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে পঁচিশ কোটি টাকা। ক্যালিফোর্নিয়ার ডিজনিল্যাণ্ডে যা-যা আছে তার বেশির ভাগই এতে থাকবে। বাড়তিও থাকতে পারে। এর থেকে আনন্দের খবর আর কী হতে পারে!

ওয়াল্ট ডিজনির হাতে-গড়া ডিজনিল্যান্ডের উদ্বোধন হয়েছিল ১৯৫৫ সালের ১৫ জুলাই। ক্যালিফোর্নিয়ার এই ডিজনি-রাজ্যের অসীম জনপ্রিয়তায় উংসাহিত হয়ে ডিজনি আরও বিরাট আকারে একটা কিছু করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি এ-কথা স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন, নতুন জায়গাটিও ডিজনি-ল্যান্ডের অনুকরণে হবে না—দোয়্যার উড নেভার বি অ্যানাদার ডিজনিল্যান্ড। আরম্ভ হল ডিজনিওয়ার্লড তৈরির কাজ। ১৯৬৭-তে। ফ্লোরিডার ওরল্যান্ডোর বিস্তৃত জলাভূমিকেই বেছে নেওয়া হল এই কাজের জন্যে। ১৯৭১ সালের অক্টোবরের প্রথম দিনটিতে ডিজনিওয়ার্লডের দরজা খুলে দেওয়া হল শিশুদের জন্যে।

ডিজনি কিন্তু তাঁর এত সাধের ডিজনি ওয়ার্লড দেখে যেতে পারেননি।

সকলেই জানেন ওয়াল্ট ডিজনি, যাঁর আসল নাম ওয়াল্টার এলিয়াস ডিজনি, একজন চলচ্চিত্র প্রযোজক ছিলেন। তিরিশ বছর প্রযোজনা করে তিনি সমসংখ্যক অ্যাকাডেমি

পুরস্কার পেয়েছেন। ডিজনির অমর সৃষ্টি কয়েকটি কার্টুন চরিত্র—মিকি মাউস, ডোনাল্ড ডাক, গুফি, ব্রিয়ার ফক্স ইত্যাদি। ডিজনিই সর্বপ্রথম এইসব কার্টুন সিনেমার পর্দায় প্রাণবন্ত করেন। মিকি, ডোনাল্ড, গুফি চলচ্চিত্রের পর্দায় চলাফেরা, লাফালাফি, ছুটোছুটি আর দুষ্টুমি করে। আবার পাঁচজনের সঙ্গে ভাবসাব করে মনের আনন্দে গান গায়। গত পাঁচ দশক ধরে এরা দেশবিদেশের ছেলে-বুড়োদের অফুরন্ত আনন্দ দিয়ে আসছে।

ডিজনিল্যান্ডের মতো ডিজনিওয়ার্লডেও এরা আছে। জীবন্ত হয়েই। কেমন করে? আসলে ওখানকার কর্মীরাই কেউ মিকি, কেউ ডোনাল্ড, কেউ বা গুফি সেজে থাকে। সারাদিন তারা এইভাবেই থাকে।

কী আছে ডিজনিওয়ার্লডে? কীসের আকর্ষণে সেখানে প্রতি বছর নানা জায়গা থেকে নানা বয়সের দেড় কোটি নর-নারী ও শিশু ছুটে আসে? উত্তর দিতে গেলে প্রশ্ন করতে হয়, কী নেই সেখানে? রূপকথার জগৎ বেড়াবার খেলাধুলো করার জায়গা, নাচ-গান, হৈ-হল্লা করার অফুরন্ত সুযোগ, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—সবই আছে।

রূপকথার আর উপকথার রাজ্য ডিজনি ওয়ার্লড। যাদের আকর্ষণ আমাদের কাছে চিরন্তন।

ঠিক এই চাহিদাই মিটিয়েছে ডিজনি-ওয়ার্লড। যে-সব রূপকথা, উপকথা ও কাহিনী বা ছবি বারবার পড়ে বা দেখেও আমাদের তৃপ্তি হয় না, তাদের বিভিন্ন সুপরিচিত চরিত্রগুলিকে আমাদের সামনে হাজির করা হয়েছে। সমস্ত রকম চেষ্টা করে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই অলৌকিক, অলীক-মধুর স্বপ্নলোক যেখানে যাওয়ার সাধ আমাদের আছে, কিন্তু সাধ্য নেই। যে স্বপ্নলোক কোনোদিন ছিল না, বা কোনোদিন হবেও না, যার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবেই আমাদের মনোরাজ্যে, তাকেই ধরে রেখেছে ডিজনি ওয়ার্লড।

ডিজনিওয়ার্লডের সমস্ত কিছুর নামকরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো না কোনো বিখ্যাত চরিত্র, কথা ও কাহিনী বা ডিজনির নিজের কোনো ছায়াছবি আছে। শুধু যে কর্মীরা নানা রকম সেজে থাকে তাই নয়, পথে ঘাটে বাসস্টপের বোর্ডে, সর্বত্রই ডিজনির তৈরি কার্টুন-চরিত্রের ছড়াছড়ি। এমন-কী বাচ্চাদের হাতের বেলুনগুলোও মিকির মুখের আদলে তৈরি।

ওরল্যান্ডোর ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ইউ এস হাইওয়ে ১৯২-এর পাশেই ওয়াল্ট ডিজনি ওয়ার্লডের প্রবেশদ্বার। ইন্টারস্টেট ৪ এর ঠিক পশ্চিমে। সাতাশ হাজার চারশো একর (৮২,২০০ বিঘা) জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ডিজনি-ভুবন। বিশাল এলাকা। বারো হাজার গাড়ি পার্ক করার জায়গা আছে। ডিজনি-ওয়ার্লডের আড়াই হাজার একর জায়গা নিয়ে আছে ছুটির দেশ—ভেকেশন কিংডম। আর ছুটির দেশ তথা গোটা ডিজনিওয়ার্লডের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ জাদুরাজ্য—ম্যাজিক কিংডম। একশ একরেরও বেশি এলাকা নিয়ে তৈরি ম্যাজিক কিংডমে আছে ছ'টি কথালোক (থীমড ল্যান্ড)—ফ্যান্টাসিল্যান্ড, ফ্রন্টিয়ার ল্যান্ড, অ্যাডভেঞ্চারল্যান্ড, টুমরোল্যান্ড, মেন স্ট্রীট আর লিবার্টি স্কোয়ার। পাশাপাশি আর চার হাজার একর এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে লেক বয়েনাভিস্টা-নগরী।

ডিজনিওয়ার্লডের বিস্তীর্ণ এলাকার যে কোনও অংশ থেকেই দুটি জিনিস চোখে পড়বেই। প্রথমটি হল, আঠারো-তলা (১৮০ ফুট) উঁচু সিন্ডারেলা ক্যাসলের মিনার-গুলির কিছু অংশ। এটাই হল ম্যাজিক কিংডমে এক নম্বর দেখার জিনিস। দ্বিতীয়টি হল, টুমরোল্যান্ডের কাছে ইস্পাত আর কংক্রীট দিয়ে গড়া 'পাহাড়'—স্পেস মাউন্টেনের চুড়ো। মহাশূন্যে না গিয়েও সেখানে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হলে স্পেস মাউন্টেনে যেতে হবেই। সেখানে নকল মহাকাশযান এক-একবারে আটজনকে নিয়ে নকল মহাকাশে পাড়ি দেয়। প্রথমটা আস্তে

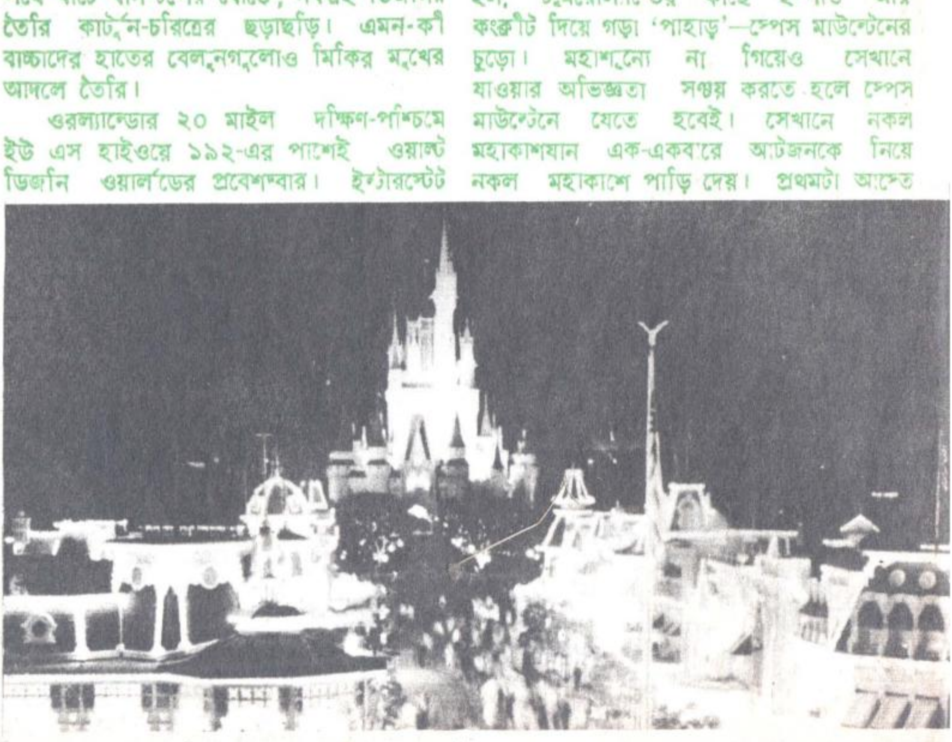

আস্তে উপরে উঠতে থাকে, তারপর ক্রমশ গতিবেগ বাড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে উল্কাবৃষ্টির মধ্য দিয়ে মহাশূন্যে গিয়ে বিভিন্ন বস্তুকে অতিক্রম করে আবার 'উৎক্ষেপণ-কেন্দ্রে' ফিরে আসে।

এ-ছাড়া ম্যাজিক কিংডমের আরও অনেক আকর্ষণ আছে। ফ্রন্টিয়ার ল্যান্ডের কান্ট্রি বিয়ার জাম্বোরি, লিবার্টি স্কোয়ারের হন্টেড ম্যানসন, হল অব প্রেসিডেন্টস, অ্যাডভেঞ্চারল্যান্ডের পাইরেটস অব দা ক্যারিবীয়ান, টুমরোল্যান্ডের টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লীগস আন্ডার দা সী আর ম্যাজিক কার্পেট অ্যারাউন্ড দা ওয়ার্ল্ড, প্রত্যেকটিই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয়।

জাদুরাজ্যের সব গল্প এখানেই ফুরিয়ে যায় না। মেন স্ট্রীটে প্রতিদিন দুবার (সাড়ে বারোটায় আর সাড়ে পাঁচটায়) ডিজনির সুপরিচিত চরিত্রগুলির রঙিন শোভাযাত্রা বের হয়। সে এক দেখার মতো জিনিস। মিকি মাউসের পরিচালনায় ২০ জন বাজিয়ে ব্যান্ড বাজায়। সঙ্গে থাকে অন্যান্য ডিজনি চরিত্রগুলি। আরও দেখতে পাওয়া যাবে ডাম্বো সার্কাস ট্রেন, আংকল রেমাস ওয়াগন এবং উইনি দা পু আর তার মধুভান্ড। আর লিবার্টি স্কোয়ারের ফাইফ অ্যান্ড ড্রাম কোর জর্জ ওয়াশিংটনের সৈন্যদলের পোশাকে সেজে তাদের কায়দায় কুচকাওয়াজ করে ও সে-আমলের সুর বাজিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীকে হাজির করে দেয় দর্শকদের সামনে। আজকের গান-বাজনা যাঁরা পছন্দ করেন, তাঁদের নিরাশ হওয়ার কিছু নেই, ফ্যান্টাসিল্যান্ড আর টুমরোল্যান্ডে গেলেই তাঁরা মনের মতো গান-বাজনা শুনতে পাবেন।

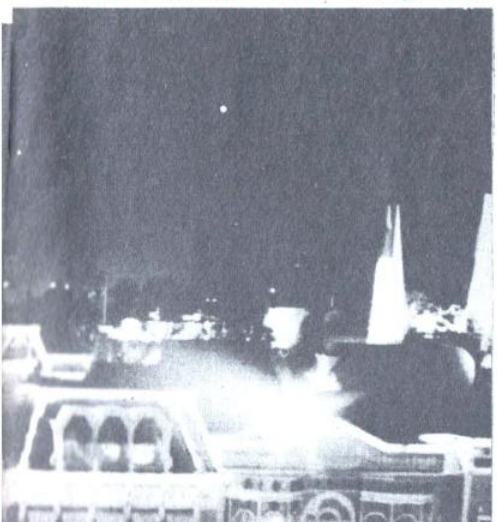

আর যাঁরা পাখির গান শুনতে চান তাঁদের যেতে হবে ট্রেজার আইল্যান্ডে—যেখানে সরবে আমন্ত্রণ জানাবে ময়ূর, চিত্রবিচিত্র গিনিফাউল,

রঙবেরঙের কাকাতুয়া আর লম্বা লেজওয়ালা ম্যাকাও পাখির ঝাঁক। সঙ্গে থাকবে হরেক রকমের দুষ্প্রাপ্য পাখি। শুধু পাখিই নয়, অজস্র দুষ্প্রাপ্য গাছ, লতাপাতাও আছে ট্রেজার আইল্যান্ডে। আর সারা ছুটির দেশে ছড়ানো রয়েছে গাছ ছেঁটে তৈরি করা নানা জন্তু-জানোয়ারের সুন্দর আকৃতি—সংখ্যায় অন্তত একশ হবেই।

কী অপরূপই না জাদুরাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য! চারদিকে নীল আর সবুজের সমারোহ। সবুজ মাঠ। ভাল না লেগে যায় না। দুটি গলফ কোর্স ছাড়াও ৬০০ একর এলাকার বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর আছে, যেখানে ৭০০টি ক্যাম্পিং করার জায়গা আছে। আর নীল জল। সমগ্র এলাকাটাতেই হ্রদ, ছোট নদী আর সুইমিং পুলের ছড়াছড়ি। এমন-কী শীতকালেও যাতে উৎসাহে ভাটা না পড়ে তার জন্যে আছে পনেরোটি উষ্ণ জলের সুইমিং

পুল। সবচেয়ে মজার হচ্ছে রিভার কান্ট্রি ওয়াটার রিক্রিয়েশান এরিয়া, সেখানে ওয়াটার ফ্লুমে ভেসে বেড়ানো যেতে পারে, কিংবা নদী-প্রপাতে টিউব ভাসিয়ে চড়ে বেড়াতেও বাধা নেই। আরও আছে। বিরাট সেভেন সীজ লেগুন, দুশো একর এলাকা নিয়ে আর তার দ্বিগুণেরও বেশি জায়গা নিয়ে স্বাভাবিক হ্রদ বে লেক। যার যেমনটি চাই সে তাই করতে পারে। প্রসন্ন দিবালোকে রৌদ্রস্নান করতে, সাঁতার কাটতে, মাছ ধরতে, নৌকা বাইতে—সব কিছুই স্বচ্ছন্দে করা যাবে। আবার জ্যোৎস্না-রাতে সবাই মিলে বনে যেতে চাইলে কি শুক্লা একাদশীতে তন্দ্রাহারা শশীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাস্তবের পারাবারে খেয়া বাইতে চাইলে কিংবা স্কি করতে চাইলে ক্ষতি নেই।

এত বড় আর এত সুন্দর জায়গা, এত কিছু দেখার জিনিস, সেখানে নিশ্চয়ই হেঁটে হেঁটে বেড়ানো যায় না। অবশ্য যারা চায় তারা বেড়াবেই। কিন্তু সাধারণের জন্যে যান-বাহনের ব্যবস্থা করতেই হয়। হয়েছেও তাই। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্রই যানবাহনের ব্যবস্থা আছে ডিজনিওয়ার্লডে। সবই পাওয়া যাবে—জলে ক্যাপরি, ক্যাটাম্যারান, সানফিশ, মিনি স্পীড বোট, পেডাল বোট, মোটর লঞ্চ ও সাধারণ খেয়া নৌকা। ক্যানো, মোটর লঞ্চ ও ফেরি বোট তো আছেই। স্থলপথের প্রধান যানবাহন ট্রাম, স্টীম ট্রেন, মোটর কোচ, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মিনি বাস আর শাটল বাস। তবে কেউ যদি বাইসাইকেল বা ঘোড়া ভাড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াতে চায়, তার সুযোগও আছে। কিন্তু মাটি থেকে ৫০ ফুট উঁচুতে এক চাকার মনোরেল ট্রেন না চাপলে বেড়ানোর আনন্দর বারো আনাই মিছে হয়ে যাবে, তাই না? আর ওটাকে অন্তরীক্ষ বলতে পারি নিশ্চয়ই। তাতে যদি কেউ খুঁত-খুঁত করে তাহলে তাকে প্লেনে চাপানোর ব্যবস্থা করতেই হয়।

কেউ কেউ বলবেন, খালি পেটে কি অত ঘোরা যায়? তার জন্যেও ব্যবস্থা আছে। কুড়িটিরও বেশি ভাল ভাল রেস্তোরাঁ আছে, আছে অনেক স্ন্যাক বার, কফি বার। লাঞ্চ বক্সও কিনতে পাওয়া যাবে। আবার কেউ-কেউ বলতে পারেন একদিনে ঘুরে ঘুরে অত দেখা সম্ভব নয়, কিংবা তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তাঁদের জন্যে কণ্টেম্পোরারি রেজর্ট, পলিনেসিয়ান ভিলেজ, গলফ রেজর্ট ইত্যাদি বিখ্যাত হোটেল আছে। প্রথমটিই সবচেয়ে বড়। ঘর আছে ১,০৫৭টি। মাথা-কাটা ইংরেজী 'এ' অক্ষরের আকৃতির এই ১৪-তলা হোটেলটি থেকে ছুটির দেশের পুরো দৃশ্যটা পাওয়া যায়। এর লবি দিয়েই নিঃশব্দে মনোরেল যাওয়া-আসা করছে। তিনটি সুইমিং পুল আছে এখানে, একটি একেবারে বাচ্চাদের জন্যে, একটি অলিম্পিক মাপের আর একটি পাশের বে লেকের জলে মিশেছে। রাতে যখন বে লেকের জলে আলো-ঝলমল হোটেলটির প্রতি-বিম্ব দোলে, তখন মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। 'পলিনেসিয়ান ভিলেজ' হোটেলও কিছু মাত্র কম নয়। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের

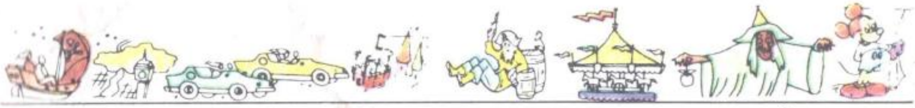

দ্বীপপুঞ্জের গ্রাম্য সংস্কৃতি ও পরিবেশকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সেটা এক-একটি অতিথি-নিকেতনের নাম থেকেই বোঝা যায়। তাহিতি, ফিজি, সামোয়া, টোঙ্গা, হাওয়াই, বোরা বোরা, মাউই—এই সাতটি দ্বীপের নামে সাতটি চমৎকার অতিথি-নিকেতন। প্রতিটিই কুঁড়েঘরের ধাঁচে তৈরি। একরের পর একর সারিবন্দী পাম গাছ আর জলপ্রপাতযুক্ত সুইমিং পুল পলিনেসিয়ান ভিলেজকে লোভনীয় করে তুলেছে।

এ-কথা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ডিজনি-ভুবনে আলোর বান ডাকে। রাত ন'টায় লেকের আর লেগুনের জলের বুকে জ্বলে উঠে ঘুরে বেড়ায় নানা রঙের মাছ, পাখি ও নানারকম জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি। সবই ইলেকট্রিকের কারসাজি। আলো, নাচ, গান, সিনেমা আর ক্যাম্প-ফায়ারে রাতের ডিজনি-ভুবন অসামান্য।

ডিজনিলোকে প্রয়োজনীয় সবরকম সুযোগ-সুবিধাই আছে। খেলাধুলো ভালবাসেন তাঁদের জন্যে গল্‌ফ, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, ভলিবল, বেসবল, টেদ্যারবল, হর্স-সু, সাফলবোর্ড ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা আছে।

বাচ্চাদেরও দোলনা, ঢেঁকি ইত্যাদি আছে। ফোটো তোলার জন্যে ক্যামেরা ভাড়া পাওয়া যায়, ফিল্ম কিনতে ও প্রসেসিং করতে পারা যায়। ফার্স্ট এড সেণ্টার, কুকুর রাখার জন্যে কেনেল ক্লাব, একেবারে বাচ্চাদের আটকানোর জন্যে বেবি সিটিংয়ের ব্যবস্থা, এমন-কী সান্ধ্য উপাসনার ব্যবস্থা পর্যন্ত আছে। আর কী চাই?

তবু এখানেই শেষ নয়। জীবনের প্রান্তে এসে ডিজনি অনুভব করেছিলেন যে, এমন একটা জিনিসের প্রয়োজন যা হবে যুগোপযোগী, আবার তার থেকে নিছক আনন্দ ছাড়াও লোকে কিছু শিক্ষালাভ করতে পারে। তাই কথা ও কাহিনীর রাজ্যের পাশে এ-যুগের জীবনযাত্রার বাস্তবতাকে স্থান দেওয়ার ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরীরা সেই কল্পনাকে রূপ দিচ্ছেন। ডিজনিওয়ার্লডের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে এক্সপেরিমেণ্টাল প্রোটোটাইপ কম্যুনিটি অব টুমরো বা সংক্ষেপে, প্রতিটি শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে, 'এপকট'। এপকটের উদ্দেশ্য হল গবেষণা, শিক্ষাদান। আশা করা যাচ্ছে যে, আসছে বছরের শেষের দিকেই এর প্রথম অংশ, যার উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, সমাপ্ত হবে। এতে থাকবে—ভবিষ্যতের পৃথিবী (ফিউচার ওয়ার্লড) আর পৃথিবী-দর্শন (ওয়ার্লড শো-কেস)। প্রথমটি একটি কর্মকেন্দ্র যেখানে গেলে লোকে বিশেষ-বিশেষ সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে। দ্বিতীয়টিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের স্থায়ী প্যাভিলিয়ন থেকে আরম্ভ করে ছাত্রবিনিময় পর্যন্ত অনেক কিছুরই ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম পর্ব শেষ হলে হাত দেওয়া হবে এপকটের দ্বিতীয় ও আসল পর্বে; দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা এসে গবেষণা করবেন যাতে তাঁদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান সাধারণ লোকেও লাভ করতে পারে। সুতরাং ওয়াল্ট ডিজনি প্রোডাকশন্সের লক্ষ্য তিনটি : আনন্দ দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো। ইংরেজিতে তিন 'ই' (এন্টারটেনমেণ্ট, এডুকেশন, এক্সপেরিমেণ্টেশন)। ডিজনিওয়ার্লডের এত কাণ্ডকারখানার জন্যে যত বিদ্যুৎশক্তি লাগে তার বিরাট অংশ ডিজনিওয়ার্লডেই তৈরি হয়। লোডশেডিংয়ের ভয় নেই।

ডাক্তারের কুকুর ডাক্তার

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মেজমামা অষ্টাবক্র মুনির মতো কাতরাতে কাতরাতে বড়মামার ঘরে এসে ঢুকলেন। ডান হাতটা কোমরে। পরনে কালো শর্টস, স্যান্ডো গেঞ্জি। গলার কাছে একটা সোনার পদক

সেই কুকুরের জন্যে সুষম খাদ্য তৈরিতে বড়মামা ব্যস্ত। সামনে একটা বড় বই খোলা। বারে বারে পাতা উলটে যাচ্ছে বলে আমার ওপর হুকুম হয়েছে, ''ধরে থাক। বই আর ছাত্র দুপক্ষই সমান চঞ্চল। শুধু ছাত্রদের দোষ দিলেই তো হবে না, বইয়ের স্বভাবটাও তো দেখতে হবে। তখন থেকে খোলা রাখার চেষ্টা করছি। চশমার খাপ, পেপার ওয়েটমোয়েট কোনো কিছু দিয়েই জব্দ করা যাচ্ছে না। স্বভাব যাবে কোথায়? পাতায় পাতায় এত জ্ঞান ঠাসা, স্বভাবে নির্বোধ। ঝপাত করে বন্ধ

ঝুলছে। চোখে চশমা নেই তাই মুখটা একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে।

বড়মামা সকাল থেকেই আজ ভীষণ ব্যস্ত। বড়মামার কুকুর লাকি নাকি রোগা হয়ে যাচ্ছে। গায়ে বুরুশ দিলেই গাদা গাদা লোম উঠে আসছে। সাতদিন আগেও বড়মামাকে দেখলে যে-ভাবে যত ঘনঘন পটাক পটাক ন্যাজ নাড়ত ইদানীং তত জোরে আর নাড়ছে না। নাড়ছে তবে দেয়ালঘড়ির পেন্ডুলামের মতো ধীরে ধীরে, একবার এদিকে একবার ওদিকে। ডাকেরও আর তেমন ঝাঁঝ নেই। মিইয়ে মিইয়ে ডাকে। সব সময় হাতপা ছড়িয়ে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে থাকে।

হয়ে গেলেই হল।''

একটু আগেই বইয়ের সঙ্গে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে। বইটার মাঝামাঝি একটা জায়গা খুলে বড়মামা একপাশে চাপা দিয়েছিলেন চশমার খাপ আর একপাশে একখণ্ড চৌকো কাঠ। আমি বসে ছিলুম জানালায় পা তুলে। হাতে টিনটিন। মেজমামা কালই এনে দিয়েছেন। কোমর দুরমুশ করে দেবার পুরস্কার। হঠাৎ হুম্মার দুড়দুড় শব্দ। কাঠের টুকরো, চশমার ভারী খাপ দুটোই মেঝেতে। পাশাপাশি চিৎপাত। পরক্ষণেই বইটাও মেঝেতে। বড়মামার দাঁত কিড়মিড় করছে, "রাসকেল, থার্ডগ্রেড ইডিয়েট। আমি

দেখছি, দেখে যাচ্ছি।''

বড়মামা বইটাকে মেঝেতে ফেলে জায়গা মতো খুললেন। তারপর সেই খোলা বইয়ের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসেই বললেন, ''যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। লাইক ডগ, লাইক ক্লাব।''

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মন্তব্য করলেন, ''রাসকেল শব্দটা গালাগাল নয়। তুমি আবার মেজকে গিয়ে যেন বোলো না বড়মামা সবসময় গালাগাল দেন।''

''বইটার ওপর ওভাবে বসলেন?''

"ওর মেরুদণ্ড ভেঙে না দিলে কাজ করা যাবে না। মানুষের মতো জ্বালাতনে স্বভাব হয়েছে। উনি খোলা থাকতে চান না, বন্ধই থাকবেন। এই যা ব্যবস্থা হল এখন সারা-জীবন খোলাই থাকবে, বন্ধ আর হবে না।"

মোটা রেকসিন বাঁধাই 'ডগ ম্যানুয়েল'। পাতায় পাতায় পৃথিবীর যাবতীয় কুকুরের ছবি। বড়মামার ভারে সামান্য দমে গেলেও মেরুদণ্ডের জোর এখনও বেশ প্রবল। বইটার ওপর আরও অত্যাচারের প্ল্যান হচ্ছিল। মমতা পড়ে যাওয়ায় ছুটে এসে ধরে আছি।

টেবিলের কাঁচের ওপর নানারকম ট্যাবলেট ফেলে শিশির পেছন দিয়ে বড়মামা গুঁড়ো করছেন। কাজে এতই ব্যস্ত, মেজমামা এসেছেন লক্ষই করেননি।

মেজমামা কাতরাতে কাতরাতে বললেন, "কোমরটা আর সোজা করতে পারছি না।"

"সারা জীবন বেঁকে বসলে সোজা হবে কী করে? বেঁকেই থাকবে।'' মুখ না তুলেই উত্তর দিলেন বড়মামা।

''আহা, সোজা করতে গিয়েই তো বেঁকে গেল।''

"অ্যাঁ, সে আবার কী? কুকুরের ন্যাজ নাকি? সোজা করা যায় না?" বড়মামা এইবার চোখ তুলে তাকালেন। তাকাতেই হল।

"কোমর সোজা করা যায় না মানে? এই দ্যাখ আমার কোমর। সোজা করছি, বাকা করছি।'' বড়মামা চেয়ারে বসে বসেই মেজ-মামাকে কোমর বাঁকানো আর সোজা করার খেলা দেখাতে লাগলেন।

মেজমামার ডান হাতটা কোমরে। শরীরটা সামনে বেঁকে ধনুক। চেষ্টা করেও সোজা হতে পারছেন না। মুখ দেখে মনে হয় যন্ত্রণাও হচ্ছে। সেই অবস্থায় বললেন, ''তোমার

কোমর আর আমার কোমরে অনেক তফাত।''

বড়মামা সামনের দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছিলেন, সোজা হয়ে গেলেন, ''তার মানে? কিসের তফাত? তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ। তুমি কি নিজেকে অতিমানব ভাব নাকি? ও তোমার হল গিয়ে শৌখিন কোমর আর আমার হল গিয়ে মেহনতি কোমর।''

মেজমামা প্রতিবাদ করে উঠলেন, ''সব কথাকেই তুমি বড় বাঁকা করে নাও, বড়দা। তোমার কপালে ভিটামিন বি কমপ্লেকসের গুঁড়ো।''

বড়মামা কপালে হাত দিলেন। মেজমামা থামেননি, ''আমার কথা শেষ হবার আগেই তুমি ক্যাঁট-ক্যাট করে কথা শোনাতে লাগলে। আমি বলতে চাই, তোমার শরীরটা চিরকালই তো ভাল। ব্যায়াম-ট্যায়াম কর। আসন কর। আমার তো সে-সব নেই। কোমরটাকে না খেলিয়ে খেলিয়ে নষ্ট করে ফেলেছি।''

মেজমামার কথায় বড়মামা যেন খুশিই হলেন। প্রশ্ন করলেন, ''খেলাওনি কেন? পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান তোমার মাথায়, এই

ছ্যাঁক-ছোঁক তেলে ভাজা
কড়মড়ে তাজা
অথবা আগুনে ফেলে
মচমচে সেঁকা

সানরাইজ পাপড়

সবার সেরা
শুধু দামে ছাড়া

প্রসিদ্ধ সানরাইজ
গুঁড়োমশলা
প্রস্তুতকারকদের তৈরী

ACI/SS/1.79

SUNRISE BRAND
PURE POWDER SPICES

সানরাইজ স্পাইসেস প্রাঃ লিঃ
৪৬, পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

জ্ঞানটাই নেই, দরজার কব্জাকে যেমন খেলাতে হয় তেমনি শরীরের কব্জাকেও সচল রাখতে হয়।"

"আহা! এতদিন পরে সেই জ্ঞানটাই তো হয়েছিল। কদিন থেকে কনকন করছে, কনকন করছে, সকালে উঠে ভাবলুম, মাথার উপর হাত তুলে কানের পাশে চেপে ধরে হাঁটু না ভেঙে সামনে ঝুঁকি, ঝুঁকে পায়ের পাতা ছুঁই। হাঁটুটা একটু বাঁকলেও মোটামুটি হল, তারপর যেই সোজা হতে গেলুম খটাক করে একটা শব্দ হল, আর আমি এইরকম হয়ে গেলুম।" মেজমামার মুখ কাঁদোকাঁদো।

অন্যের দুঃখে বড়মামা সবসময়েই কাতর। উঠে দাঁড়ালেন। মেজমামাকে বললেন, "আয়, ঘরের মাঝখানে সরে আয়। ওষুধে কাজ হবে না। ফিজিওথেরাপি করতে হবে।"

মেজমামা একপাশে চেত্তা খেতে খেতে ঘরের মাঝখানে সরে গেলেন। মেজমামার বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা দেখে আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। হাসি চাপবার কুঁক-কুঁক শব্দ হল কয়েকবার। ভীষণ অসভ্যতা। কী করব, চাপতে পারছি না।

বড়মামা মেজমামার কোমরে আস্তে আস্তে দুবার চাপড় মারলেন, "অ্যাঃ, একেবারে দরকচা মেরে গেছে। রেগুলার একে তেল খাওয়াতে হবে। জং ধরে গেছে।" দু হাত পিছিয়ে এসে দেয়ালে ছবি টাঙাবার সময় যে ভাবে বাঁকা সোজা দেখে, বড়মামা সেই ভাবে মেজমামাকে দেখতে লাগলেন। "মনে রাখ, ফর্টি ডিগ্রী নর্থ, টেন ডিগ্রী ওয়েস্ট, জিরো ডিগ্রী ইস্ট।"

বড়মামার কথা শুনে মেজমামা বললেন, "তুমি যেন জাহাজ চালাচ্ছ?"

"এইবার বুঝবি কেন বাউলরা বলে দেহতরী। প্রথমে তোকে ঠেলে উত্তরদিকে চল্লিশ ডিগ্রী তুলব, তারপর দু কাঁধ ধরে পশ্চিমে ১০ ডিগ্রী মুচড়ে দেব, পুবে কিছু করতে হবে না। ব্যস, আবার তুই সোজা প্রফেসার হয়ে যাবি।"

বড়মামা কুস্তিগিরের মতো হাতের তালুতে তালু ঘষলেন। মেজমামা ভয়ে ভয়ে বললেন, "এটা তো তোমার আসুরিক চিকিৎসা হয়ে গেল দাদা। ভীষণ লাগবে। এমন-কী চিরকালের মতো আমার কোমরটা কব্জা-ভাঙা দরজার মতো ঢকঢকে হয়ে যাবে।"

"অ্যানাটমির তুমি কী বোঝ হে! মেরুদণ্ডের শেষটা কীরকম তুই জানিস? কটা হাড় আছে তুই জানিস? ওই জায়গাটার হিঞ্জ সিসটেম তুই জানিস?"

কথা বলতে বলতে বড়মামা মেজমামার দিকে এগোচ্ছেন। মেজমামা একটু একটু করে পেছোচ্ছেন। বড়মামা বলছেন, "তুই ভাবছিস সামনের দিক থেকে তোকে মারব? মোটেই না। পেছন দিক থেকে একটা হাত চালিয়ে দেব তোর গলার ওপর দিয়ে আড়াআড়ি। কাঁজটাকে লাগিয়ে দেব গলা আর দাড়ির মাঝখানের খাঁজে, তারপর পেছন দিকে মারব টান।"

মেজমামার মুখ দেখে মনে হল পালাতে চাইছেন। ক্রমশ দরজার দিকে পেছোচ্ছেন। বড়মামা ধরতে পেরেছেন, "তুই সরে-সরে দরজার দিকে যাচ্ছিস কেন? পালাবার মতলব?"

মেজমামা বললেন, "তোমার হাবভাব আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না, দাদা। যে ভাবে ব্ল্যাকপ্যান্থারের মতো গুটি-গুটি এগিয়ে আসছ! আমার ভয় লাগছে। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। নিজে নিজেই ঠিক করে নোব।"

"তার মানে? অবিশ্বাস? আমাকে হাতুড়ে ভাবছিস? ভাবছিস শরীরতত্ত্বের কিছুই জানি না?"

"আহা, তা ভাবব কেন? এই গ্রামে তোমার মতো অ্যালোপ্যাথ আর কে আছে? আসলে অ্যালোপ্যাথিতে আমার আর তেমন বিশ্বাস, না না, বিশ্বাস নয়, উৎসাহ নেই। আমি হোমিওপ্যাথি করাতে চাই।"

"ধ্যার, আমি কি তোকে অ্যালোপ্যাথি করছি নাকি? ফিজিওথেরাপিতে সবে যে ট্রেনিং নিয়ে এলুম গত তিনমাস ধরে, তারই প্রথম প্রয়োগ হবে তোর ওপর। এরকম একটা কেস এত সহজে ঘরে বসেই পেয়ে যাব ভাবিনি।"

"দাদা, তোমার পায়ে পড়ছি। বিশ্বাস করো, আমি প্রায় সোজা হয়ে গেছি। তাকিয়ে দ্যাখো? আগের চেয়ে সোজা-সোজা লাগছে না?" মেজমামা জোর করে একটু সোজা মতো হতে গিয়ে আউ করে চিৎকার করে উঠলেন।

বড়মামা শব্দ করে হেসে বললেন, "আমার হাত না পড়লে তুই মেরামত হবি না রে মেজ!"

বড়মামা দরজা আটকে ফেলেছেন, "চল, চল, ঘরের মাঝখানে একটু স্থির হয়ে দাঁড়া। তুই তো জানিস একসময় আমি কুস্তি করতুম। তুই যত চলে চলে বেড়াবি আমি আর তোকে রুগি ভাবতে না পেরে প্রতিপক্ষ ভেবে হঠাৎ একটা আড়াই-প্যাঁচ মেরে দোব, তখন মাস তিনেক আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবি না।"

বড়মামার খাটের তলায় এক টুকরো কার্পেটের ওপর লাকি হাতপা ছড়িয়ে শুয়ে ছিল। শরীর ভাল না। সারাদিন শুয়েই থাকে। পেছন দিকের অল্প একটু অংশ ন্যাজ সমেত খাটের বাইরে বেরিয়ে আছে। বড়-মামাকে সত্যিই এবার কিংকংয়ের মতো মনে হচ্ছে। যেমন করেই হোক মেজমামাকে ধরে পেছন দিকে মটকে দেবেন। মেজমামা বেকায়দা। খাটের দিকে পিছু হটছেন।

আমি জানতুম, এইরকম ঘটনাই ঘটবে। লাকির বেরিয়ে থাকা ন্যাজে মেজমামার পদপাত। অনেকদিন পরে লাকি লাফিয়ে উঠল। সেই পুরনো ঝাঁঝ, সেই পুরনো চিৎকার। ঘাউ ঘাউ করে লাফিয়ে উঠেছে। খাটে মাথা ঠুকে কেঁউ কেঁউ। মেজমামার ভীষণ কুকুর-ভীতি। আচমকা লাকির চিৎকারে অনায়াসেই সোজা হয়ে গেছেন। কোমরের খটকা নিজেরই চমকানিতে খুলে গেছে।

বড়মামা টেবিল থেকে লাকির সুষম খাদ্য তৈরির সমস্ত মালমশলা সরাতে সরাতে বললেন, "বুঝলি, ডাক্তারের কুকুরও ডাক্তার হয়। আমাকে হাত দিতেই হল না। আমার অ্যাসিসটেন্টই এক চিৎকারে তোর মেজমামাকে মেরামত করে দিলে।"

আমি বললুম, "মেজমামার পা যেন রামচন্দ্রের পা। লাকির ন্যাজে পড়তেই অহল্যা উদ্ধারের মতো চাংগা হয়ে উঠল। সেই থেকে কীরকম চেল্লাচ্ছে দেখেছেন। সেই পুরনো মেজাজ।"

কথাটা বড়মামার তেমন পছন্দ হল বলে মনে হল না।

ছবি অলোক ধর

স্টকিস্ট: মেসার্স সুখলাল মানক লাল পুরান চীনা বাজার কলিকাতা-৭০০০০১ OD/M/79-3

পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

[আগে যা ঘটেছে : সন্তু আর কাকাবাবু আবার একটি অভিযানে বেরিয়েছে। এখন তারা যে-জায়গাটায় আছে, সেখানটার নাম গোরখশেপ। এখানে শুধু পাহাড় আর বরফ, আর একটা পুরনো কালের পাথরের গম্বুজ, তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে ওরা। সামনের একটা টিলার ওপরে উঠলেই স্পষ্ট দেখা যায় মাউন্ট এভারেস্ট! কাকাবাবু প্রতি রাত্রে গম্বুজের চূড়ায় বসে থাকেন চুপ করে, আর নীচে শুয়ে থাকে সন্তু। কাকাবাবু একটা কাচের বাক্সতে করে নিয়ে এসেছেন একটা বড় আকারের মানুষের দাঁত। সেটার দিকে তাকালেই গা'টা শিরশির করে সন্তুর।]

॥ ২ ॥

কলকাতায় কিন্তু কাকাবাবু ঐ দাঁতটার কথা কিছুই বলেননি সন্তুকে। সন্তুও জানতই না যে, কাকাবাবু এবার বিলেত থেকে ঐ দাঁতটা নিয়ে এসেছেন। বিলেত থেকে সবাই কত ভাল-ভাল জিনিস আনবে, আর কাকাবাবু এনেছেন একটা মরা মানুষের দাঁত!

আন্দামান অভিযানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে এখন কাকাবাবুর ডাক আসে। জেনিভায় এক অ্যানথ্রপলজিক্যাল কনফারেন্সে কাকাবাবু বক্তৃতা দিয়ে এলেন মাস ছয়েক আগে। তারপরই গিয়েছিলেন বিলেতে। তারপর কিছুদিন কাকাবাবু বইপত্রের মধ্যে ডুবে রইলেন একেবারে। তখনই সন্তুর মনে হয়েছিল, কাকাবাবু বোধহয় আবার নতুন কোনো রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন।

একদিন হঠাৎ তিনি সন্তুকে ডেকে বলেছিলেন, "কী রে, এভারেস্টে যাবি? আমি যাচ্ছি, যদি সঙ্গে যেতে চাস্—"

শুনেই সন্তুর বুকটা ধক্ করে উঠেছিল। এভারেস্ট!

প্রথমে সন্তু যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। এভারেস্টে যাওয়া কি যেমন-তেমন কথা?

সন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, "কাকাবাবু, আপনি, মানে ইয়ে, মানে আপনি সত্যিই এভারেস্টে যাচ্ছেন?"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "সত্যি ছাড়া কি মিথ্যে বলব নাকি তোকে?"

একজন খোঁড়া মানুষ, যিনি ক্রাচে ভর না দিয়ে চলতে পারেন না, তাঁর মুখে এভারেস্ট যাওয়ার কথা শুনলে কি সহজে বিশ্বাস করা যায়? অথচ কাকাবাবু আজে-বাজে কথাও বলবেন না ঠিকই। তখন সন্তু ভেবেছিল কাকাবাবু তাহলে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার কোনো অভিযাত্রী দলের সঙ্গে যাচ্ছেন নিশ্চয়ই। সন্তু তো তবে যাবেই কাকাবাবুর সঙ্গে, এই সুযোগ কি সে ছাড়তে পারে?

নিউজিল্যান্ডের হিলারি আর আমাদের দার্জিলিংয়ের তেনজিং,—এই দু'জনই মানুষ-জাতির মধ্যে প্রথম পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গা এভারেস্টের চূড়ায় পা দেন। তারপর আমেরিকান, ফরাসি, জাপানি, আরও কত জাতির লোক এভারেস্টে উঠেছেন। এমন-কী, আমাদের ভারতীয়দের মধ্যেও একজন না দু'-জন উঠেছেন, কিন্তু কোনো বাঙালি তো এখনো সেখানে যেতে পারেনি! সন্তু উঠতে পারলে সারা পৃথিবীতে তার নাম ছড়িয়ে পড়বে। পৃথিবীর কোনো জাতেরই পনেরো বছরের কোনো ছেলে এভারেস্টে উঠতে পারেনি। আর কাকাবাবু যদি জেদ ধরেন, তা হলে তিনি উঠবেনই, সন্তুর এ-বিশ্বাস আছে। তা হলে কাকাবাবুও এক হিসেবে বিশ্বে প্রথম হবেন। কারণ, এক পা খোঁড়া, ক্রাচ বগলে নিয়ে এভারেস্টে চড়ার কথা কেউ আগে কল্পনা করারও সাহস পায়নি।

সন্তু অতি উৎসাহের সঙ্গে রাজি হয়েছিল তো বটেই, তার ওপর এভারেস্ট সম্পর্কে তার জ্ঞান দেখাবার জন্য বলেছিল, "কাকাবাবু, এভারেস্ট তো আবিষ্কার করেছিলেন একজন বাঙালি, তাই না? সাহেবরা তাঁর নামটা দেয়নি—"

কাকাবাবু একটু হেসে বলেছিলেন, "এভারেস্ট আবার কেউ আবিষ্কার করবে কী? এটা কি একটা নতুন জিনিস? তবে, এটাই যে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়-চূড়া, সেটা ঠিক করার ব্যাপারে একজন বাঙালির খানিকটা হাত ছিল বটে!"

সন্তু বলেছিল, "আমি তো সেই কথাই বলছি। তাঁর নাম রাধানাথ শিকদার। ঐ চূড়াটার নাম এভারেস্ট না হয়ে রাধানাথ হতে পারত।"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "রাধানাথ শিকদার সার্ভে অফিসে কাজ করতেন। হিমালয়ের অনেক শৃঙ্গের তখন কোনো নামই ছিল না। মিঃ এভারেস্ট ছিলেন ঐ সার্ভে অফিসের বড় সাহেব। তাঁর নামেই ঐ শৃঙ্গের নাম রাখা হয়েছে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা কাকাবাবু, ঐ রাধানাথ শিকদার তো আর এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেননি, তা হলে তিনি কী করে বুঝলেন যে, ঐটাই সবচেয়ে বেশি উঁচু?"

কাকাবাবু বলছিলেন, "পাহাড়ে না উঠেও পাহাড় মাপা যায়। ছোটখাটো পাহাড় মাপে সেগুলোর ছায়া দেখে। তা ছাড়াও যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে অনেক অঙ্ক কষতে হয়। রাধানাথ শিকদার অবশ্য এক সময় দেরাদুনে থাকতেন, তখন পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরেছেন। কিন্তু তুই যাকে "আবিষ্কার" বললি, সেটা হয়েছিল এই কলকাতায়। অঙ্ক কষতে-কষতে তিনি হঠাৎ একদিন দেখলেন যে এই যে একটা নাম-না-জানা পাহাড়, তখন কাগজপত্রে এটার নাম ছিল পীক নাম্বার ফিফটিন, এটারই উচ্চতা উনত্রিশ হাজার ফুটের বেশি, এত উঁচু পাহাড় আর পৃথিবীতে নেই। তখনই তিনি ছুটে গিয়ে তাঁর নতুন বড় সাহেবকে খবর দিলেন। এভারেস্ট সাহেব অবশ্য তখন রিটায়ার করেছেন, তবু তাঁর নামেই শিখরটির নাম রাখা হল।"

সেদিন এভারেস্ট সম্পর্কে আরও অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল। তারপর ক'দিন কাকাবাবু একেবারে চুপচাপ। যেন ব্যাপারটা তিনি ভুলেই গেছেন। হঠাৎ একদিন কাকাবাবু চলে গেলেন দার্জিলিং। সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা কিছুই বললেন না। সেখান থেকে ফিরে গভর্নমেন্টের নেমন্তন্ন পেয়ে আবার চলে গেলেন জার্মানি। দেড়মাস বাদে যেদিন তিনি কলকাতায় ফিরলেন, তার পরদিনই সন্তুদের বাড়িতে এলেন তেনজিং। কী করে যেন কথাটা জানাজানি হয়ে গেল, সন্তুদের বাড়ির সামনে সেদিন সাঙ্ঘাতিক ভিড় জমে গিয়েছিল। তেনজিংকে একটু দেখবার জন্য, তাঁর সই নেবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

তেনজিংয়ের সঙ্গে কাকাবাবু নিজের ঘরে বসে কথা বললেন অনেকক্ষণ। তখন ঘরে আর কেউ ছিল না। সন্তু ঘুরঘুর করছিল কাকাবাবুর ঘরের কাছে, কিন্তু কোনো কথাই শুনতে পায়নি। তেনজিং বিদায় নেবার সময় বন্ধুর মতন কাকাবাবুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলেছিলেন, "গুড লাক! আই উইশ ইউ সাকসেস, মিঃ রায়চৌধুরী! আপনি পারবেন, তখন সবাই বুঝে যাবে, আমার কথা ঠিক কি না! বয়েস হয়েছে, না হলে আপনার সঙ্গে আমিও যেতাম!"

ইস্কুলের বন্ধুদের কাছে সন্তু আগেই বলে ফেলেছিল যে, এবার সে কাকাবাবুর সঙ্গে এভারেস্ট অভিযানে যাবে। সবাই খুব হেসেছিল। বন্ধুদের এই একটা দোষ, কোনো কথাই ওরা আগে থেকে বিশ্বাস করে না। তেনজিং নোরগে ওদের বাড়িতে আসবার পর সন্তু আবার বলেছিল, "দেখলি তো? আমার কাকাবাবুর সঙ্গে কত লোকের চেনা। তেনজিং নিজে আমাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন!"

সন্তুদের স্কুলে পুজোর ছুটি শুরু হল যেদিন, সেদিনই কাকাবাবু বলেছিলেন, "সন্তু, তৈরি হয়ে নাও, সামনের সোমবার আমরা বেরিয়ে পড়ছি।"

সন্তুর ধারণা ছিল এভারেস্ট অভিযানে যেতে হলে বিরাট দলবল লাগে, অনেক

জিনিসপত্র আর তাঁবু-টাঁবু নিয়ে যেতে হয়। সেসব কিছুই নয়, কাকাবাবু শুধু সন্তুকে নিয়ে প্লেনে চেপে চলে এলেন নেপাল। কাঠমাণ্ডু শহরে ছ'দিন চুপচাপ সন্তু একটা হোটেলে বসে কাটাল। কাকাবাবু একা-একা ঘোরাঘুরি করলেন নানা জায়গায়। সন্তু ভেবেছিল, কাকাবাবু নিশ্চয়ই নেপালে এসে দলবল জোগাড় করছেন।

তাও হল না। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই কাকাবাবু বললেন, "বাক্স গুছিয়ে নে, এক ঘণ্টার মধ্যেই বেরুব।"

কাকাবাবু এক-এক সময় খুব কম কথা বলেন। তখন তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করারও নিয়ম নেই। সন্তু চুপচাপ সব কথা শুনে যায় শুধু।

কাঠমাণ্ডুর হোটেল থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে আসা হল। সন্তু ভাবল, আবার বুঝি কলকাতায় ফিরে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এবার উঠল ওরা একটা ছোট প্লেনে। মাত্র দশ-বারোজন যাত্রী। কিছুক্ষণ ওড়ার পরই সন্তু দেখতে পেল সব বরফের মুকুট-পরা পাহাড়ের চূড়া।

প্লেনটা এসে নামল একটা খুব ছোট্ট জায়গায়। এরকম জায়গায় যে প্লেন নামতে পারে, তা বিশ্বাসই করা যায় না। জায়গাটার নাম সিয়াংবোচি। সেখান থেকে দু'জন মাত্র মালবাহক সঙ্গে নিয়ে শুরু হল হাঁটা। সন্তুর তখনও সব ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগছিল। দু'জন মাত্র লোক সঙ্গে নিয়ে এভারেস্টে ওঠা হবে? তাঁবু কোথায়? অন্য সব জিনিসপত্র কোথায়? পাহাড়ি রাস্তায় ক্রাচ বগলে নিয়ে কাকাবাবুকে হাঁটতে দেখে অন্যান্য যাত্রীরা অবাক হয়ে ফিরে-ফিরে তাকাচ্ছে। এরকম কোনো লোককে এত উঁচু পাহাড়ের রাস্তায় কেউ কোনোদিন দেখেনি। এ রাস্তায় অনেক বিদেশী দেখা যায়। সাহেব তো আছেই, কিছু কিছু মেমও কাঁধে ব্যাগ নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরে। সিয়াংবোচিতে জাপানিরা একটা মস্ত বড় হোটেল বানিয়েছে।

কাকাবাবু কারুর দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। ক্রাচ ঠুকে ঠুকে ঠিক উঠে যান পাহাড়ি রাস্তা

দিয়ে। সন্তু হাঁপিয়ে যায়, কিন্তু কাকাবাবুর যেন দৈত্যের শরীর।

এইরকম একটি পাহাড়ি রাস্তায় এক দুর্ঘটনায় কাকাবাবুর একটা পা চিরকালের মতন পঙ্গু হয়ে গেছে। তবু পাহাড়কে ভয় পান না কাকাবাবু।

ফুনটুংগা বলে একটা ছোট জায়গা পেরিয়ে এসে রাস্তার পাশে একটা বড় পাথরের ওপর বসে সন্তু আর কাকাবাবু কমলালেবু, পাঁউরুটি আর ডিমসেদ্ধ খেয়ে নিচ্ছিল, এমন সময় কয়েকটি পাহাড়ি লোক ছুটতে-ছুটতে এসে বলে গেল, "পালাও, পালাও, সাবধান, বুনো ভাল্লুক বেরিয়েছে।"

শুনেই সন্তু চমকে উঠেছিল। চারদিকে পাহাড় আর ফাঁকা রাস্তা, ওরা পালাবে কী করে? ফুনটুংগা ফিরে যেতে গেলে তো অনেক সময় লেগে যাবে। তা ছাড়া কাকাবাবু তো পালাতেও পারবেন না।

কাকাবাবু কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে পাইপ ধরিয়ে বললেন, "কমলালেবুর খোসা রাস্তার ওপর ফেলেছিস কেন? সব খোসা এক জায়গায় সরিয়ে একটা কাগজের ঠোঙার মধ্যে রেখে দে। পাহাড় কখনো নোংরা করতে নেই।"

রাস্তার এক পাশে জঙ্গল, এক পাশে খাদ, সেই খাদের নীচে দেখা যায় একটা রুপোর হারের মতন সরু নদী। সন্তু ভয়ে-ভয়ে জঙ্গলের দিকে তাকাল। সন্তুর মনে হল, হঠাৎ সেখান থেকে একটা ভাল্লুক এক লাফে বেরিয়ে আসবে।

এর পরে দু'জন সাহেবও ছুটতে-ছুটতে নেমে এল ওপরের রাস্তা দিয়ে। তারাও কাকাবাবুকে দেখে ইংরেজিতে বলল, "তোমরা এখানে বসে আছ কেন? নীচে নেমে যাও। এদিকে একটা বুনো ভাল্লুক দেখা গেছে।"

কাকাবাবু কোনো কথা বললেন না।

একটু বাদে আবার শোনা গেল অনেক মানুষের চিৎকার। এবার ভাবল, নিশ্চয়ই ভাল্লুকটা ওদের তাড়া করে আসছে।

লোকগুলো কাঁধে করে বয়ে আনছে একজন আহত মানুষকে। তার গা থেকে তখনো রক্ত ঝরছিল। লোকটি সেই অবস্থাতেও জ্ঞান হারায়নি, 'আঁ আঁ অ্যাঁ' শব্দ করছে।

কাকাবাবুকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না, সেই লোকগুলো নিজেরাই চিৎকার করে অনেক কথাই বলল, যাতে বোঝা গেল যে, বনের মধ্যে এই লোকটিকে ভাল্লুকে আক্রমণ করে ওর পেটের নাড়িভুঁড়ি বার করে দিয়েছে। লোকটিকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালে।

ওরা চলে যাবার পর সন্তু দেখল, রাস্তায় পড়ে আছে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত। মানুষের রক্ত।

কাকাবাবু বললেন, "পাহাড়ি ভাল্লুকরা খুব হিংস্র হয়! এক হিসেবে বাঘ-সিংহের চেয়েও হিংস্র, এরা অকারণে মানুষ মারে।"

কোটের ভেতরের পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোর ভয় করছে?"

সন্তু কী উত্তর দেবে? চোখের সামনেই তো সে দেখল যে, ভাল্লুকে একটা লোকের পেট ফালাফালা করে দিয়েছে। হঠাৎ যদি ভাল্লুকটা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? রিভলবার দিয়ে কি ভাল্লুক মারা যায়? সন্তু সব শিকারের গল্পে পড়েছে যে, শিকারীদের হাতে থাকে রাইফেল।

গলা শুকিয়ে এসেছে, তবু সেই শুকনো গলাতেই সন্তু উত্তর দিয়েছিল, "না।"

কাকাবাবু বললেন, "তুই এই পাথরটার আড়ালে গিয়ে বোস্। আমাদের এই রাস্তা দিয়েই উঠতে হবে, বেশিক্ষণ তো সময় নষ্ট করলে চলবে না!"

সন্তু এবার একটু সাহস করে বলল, "কাকাবাবু, সবাই নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে! আমরাও নীচের গ্রামটায় ফিরে গিয়ে আজকে থেকে গেলে পারি না? এমন-কী, সাহেবরাও নেমে যাচ্ছে।"

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, "এমন-কী সাহেবরাও মানে? সাহেবরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সাহসী নাকি?"

সন্তু একটু থতমত খেয়ে বলল, "না। মানে, ইয়ে—"

কাকাবাবু একটুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "কোথাও যাবার জন্য বেরিয়ে আমি কখনো পেছনে ফিরে যাই না। আমার সঙ্গে যেতে হলে এই কথাটা তোকে সব সময় মনে রাখতে হবে।"

তারপরই সন্তুকে দারুণ ভাবে চমকে দিয়ে কাকাবাবু রিভলবার উঁচিয়ে 'ডিসুম্' শব্দে গুলি করলেন। (ক্রমশ)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব

আদিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

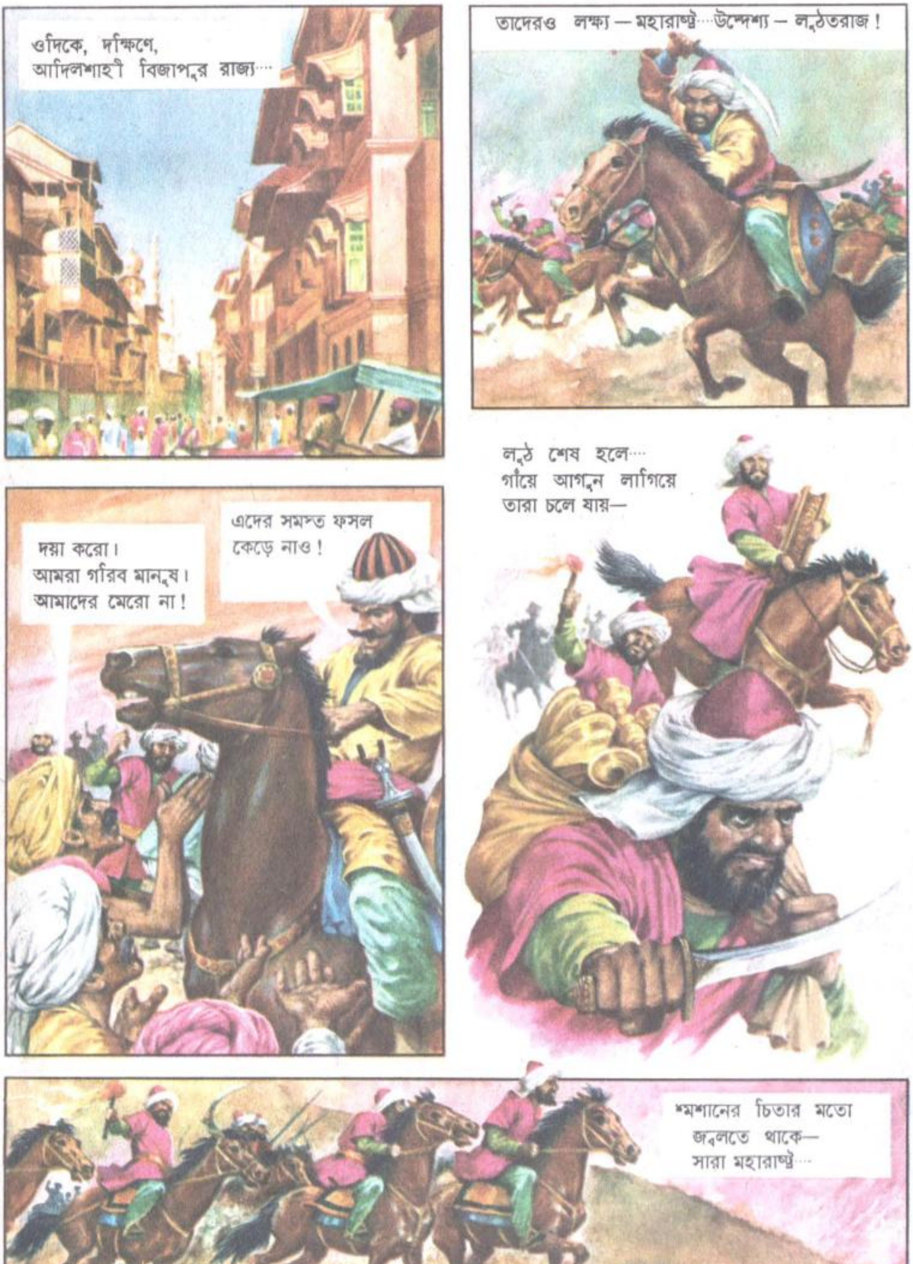

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

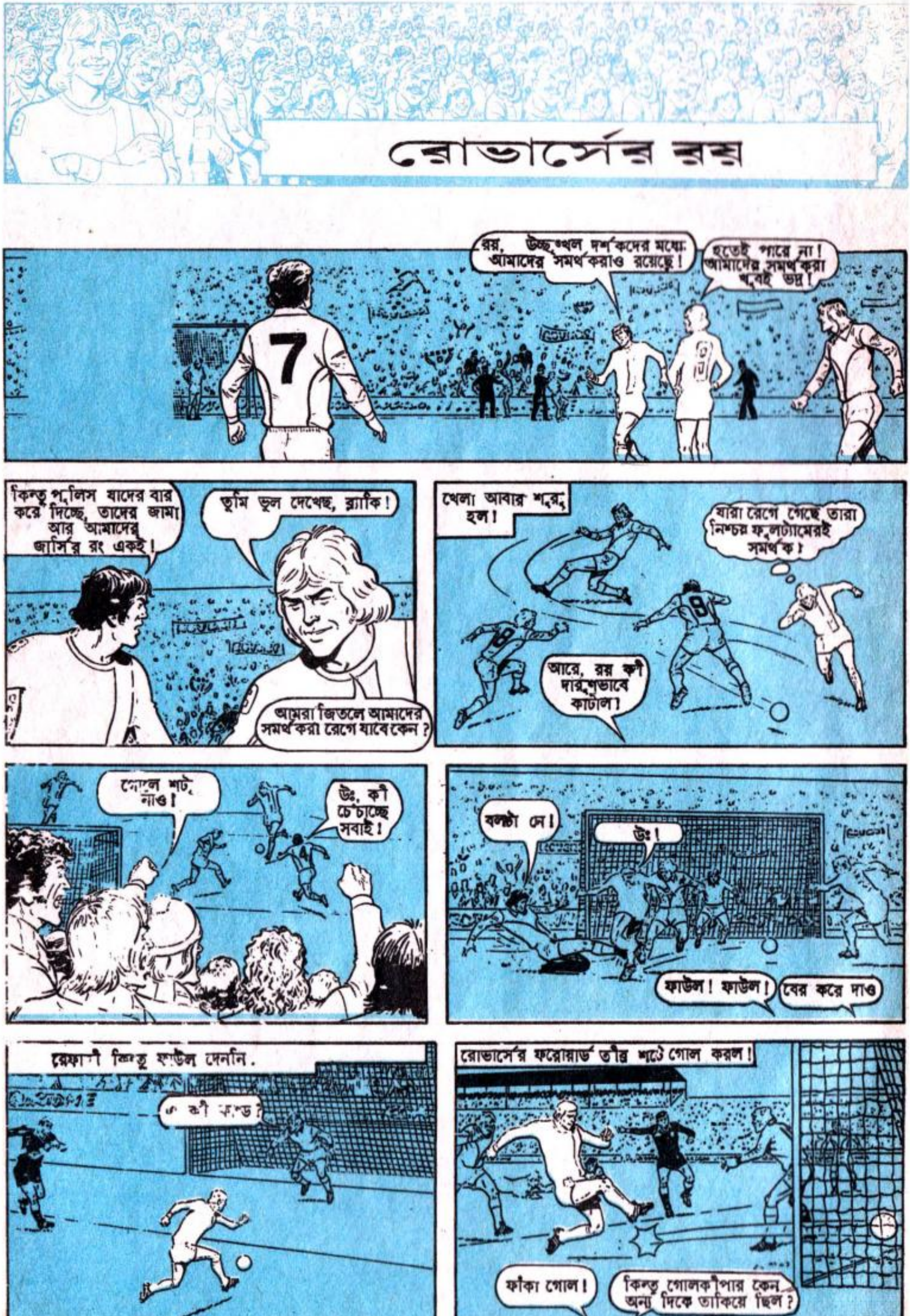
রোভার্সের রয়
রয়, উচ্ছৃঙ্খল দর্শকদের মধ্যে আমাদের সমর্থকরাও রয়েছে!
হতেই পারে না! আমাদের সমর্থকরা খুবই ভদ্র!
কিন্তু পুলিস যাদের বার করে দিচ্ছে, তাদের জামা আর আমাদের জার্সির রং একই!
তুমি ভুল দেখেছ, ব্ল্যাকি!
আমরা জিতলে আমাদের সমর্থকরা রেগে যাবে কেন?
খেলা আবার শুরু হল!
যারা রেগে গেছে তারা নিশ্চয় ফুলট্যামেরই সমর্থক!
আরে, রয় কী দারুণভাবে কাটাল!
গোল শট নাও!
উঃ, কী চেঁচাচ্ছে সবাই!
বলটা দে!
উঃ!
ফাউল! ফাউল!
বের করে দাও
রেফারী কিন্তু ফাউল দেননি.
এ কী কাণ্ড?
রোভার্সের ফরোয়ার্ড তীব্র শটে গোল করল!
ফাঁকা গোল!
কিন্তু গোলকীপার কেন অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল?

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

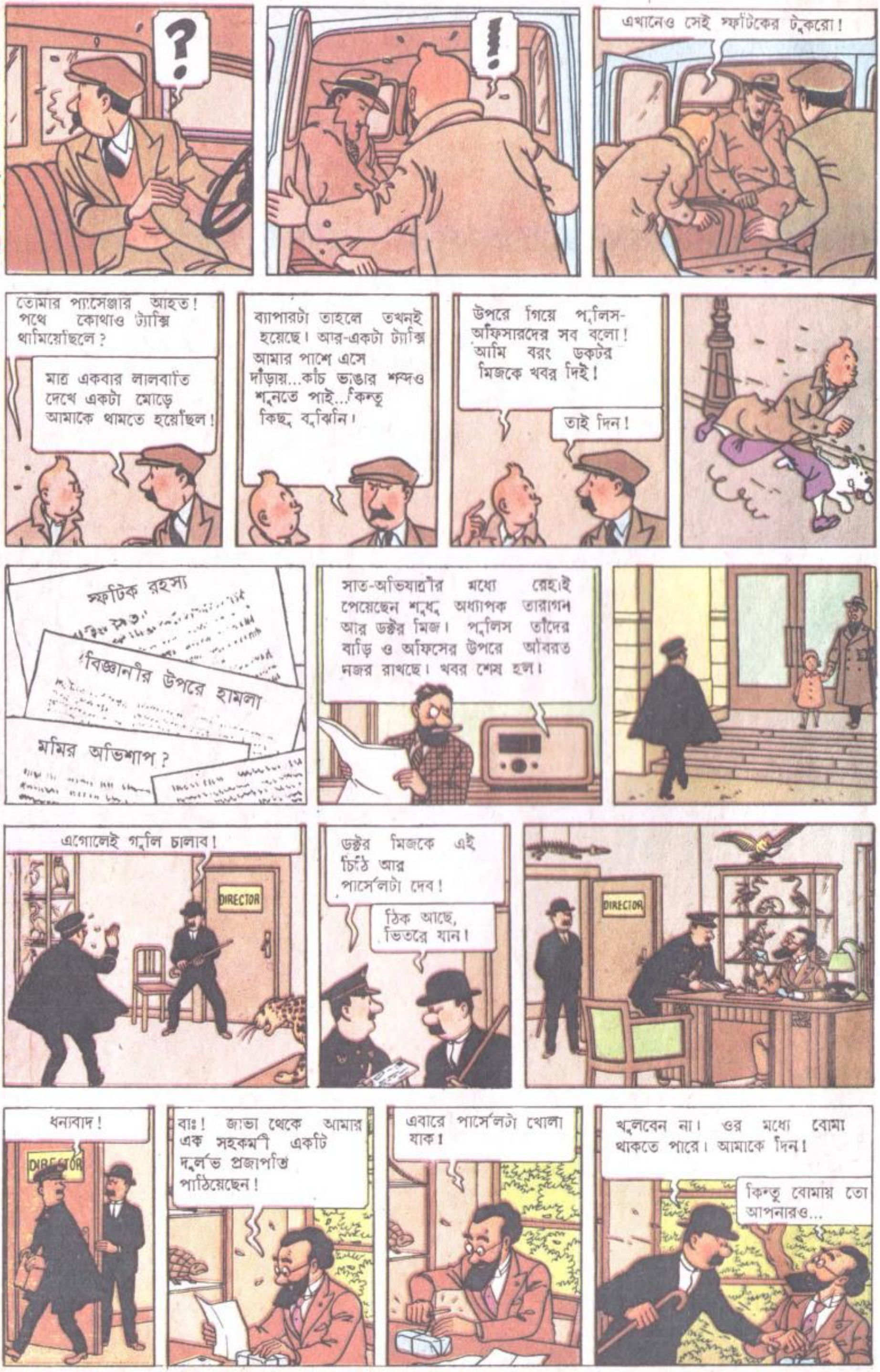
?
!
এখানেও সেই স্ফটিকের টুকরো!
তোমার প্যাসেঞ্জার আহত! পথে কোথাও ট্যাক্সি থামিয়েছিলে?
মাত্র একবার লালবাতি দেখে একটা মোড়ে আমাকে থামতে হয়েছিল!
ব্যাপারটা তাহলে তখনই হয়েছে। আর-একটা ট্যাক্সি আমার পাশে এসে দাঁড়ায়...কাঁচ ভাঙার শব্দও শুনতে পাই...কিন্তু কিছু বুঝিনি।
উপরে গিয়ে পুলিস-অফিসারদের সব বলো! আমি বরং ডক্টর মিজকে খবর দিই!
তাই দিন!
স্ফটিক রহস্য
বিজ্ঞানীর উপরে হামলা
মমির অভিশাপ?
সাত-অভিযাত্রীর মধ্যে রেহাই পেয়েছেন শুধু অধ্যাপক তারাগন আর ডক্টর মিজ। পুলিস তাঁদের বাড়ি ও অফিসের উপরে অবিরত নজর রাখছে। খবর শেষ হল।
এগোলেই গুলি চালাব!
DIRECTOR
ডক্টর মিজকে এই চিঠি আর পার্সেলটা দেব!
ঠিক আছে, ভিতরে যান!
DIRECTOR
ধন্যবাদ!
বাঃ! জাভা থেকে আমার এক সহকর্মী একটি দুর্লভ প্রজাপতি পাঠিয়েছেন!
এবারে পার্সেলটা খোলা যাক!
খুলবেন না। ওর মধ্যে বোমা থাকতে পারে। আমাকে দিন!
কিন্তু বোমায় তো আপনারও...

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

সেবারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ম্যাচটি খেলেছিল...
স্যুইজারল্যান্ড আর অস্ট্রিয়া। স্যুইজারল্যান্ড ৩—০ গোলে এগিয়েও শেষরক্ষা করতে পারেনি।
অস্ট্রিয়া হঠাৎ মরিয়া হয়ে সেদিন খেলতে শুরু করে, এবং শেষ পর্যন্ত ৭—৫ গোলে জিতে যায়।
ধুত, এর নাম খেলা?
আমাদের কপালটাই খারাপ!
হাঙ্গারি আর অস্ট্রিয়া সেমিফাইনালে উঠে যায়। আর ওঠে পশ্চিম জার্মানি ও উরুগুয়ে।
পশ্চিম জার্মানি অস্ট্রিয়াকে ৬—১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে!
ধুত, আমাদের গোলকীপারটা বাজে!
আমরা দাঁড়াতেই পারলুম না!
অথচ অস্ট্রিয়ার গোলরক্ষক জেমান তখন ইউরোপের একজন সেরা গোলি!
বাড়ি ফেরা যাক!
আসল কথা, পশ্চিম জার্মানি সেবার সত্যিই ভাল খেলেছিল। যেমন তাদের টীম-ওয়ার্ক, তেমনি বল-কন্ট্রোল।
তাছাড়া আক্রমণে সেদিন ফ্রিৎস ওয়াল্টার ছিলেন দুর্ধর্ষ
১৯৫৪। হাঙ্গারি আর উরুগুয়ের সেমিফাইনাল সেবারে দারুণ জমেছিল।
হাঙ্গারির খেলায় ছিল ঝড়ের গতি। জিবর আর হিদেকুটির গোলে তারা এগিয়ে যায়। তারপরেই...
রুখে দাঁড়ায় উরুগুয়ে, এবং তাদের দুর্ধর্ষ ফরোয়ার্ড হোবার্গ সেই দুটি গোলই শোধ করে দেন।
অতিরিক্ত সময়ে হাঙ্গারির ককসিস আরও দুটি গোল করেন। বাস্, হাঙ্গারি ফাইনালে উঠে গেল।
বিশ্বকাপে উরুগুয়ের সেই প্রথম পরাজয়!
রানার্স-আপ ম্যাচেও অস্ট্রিয়ার কাছে উরুগুয়ে সেবারে ১—৩ গোলে হেরে যায়।
!
উরুগুয়ের আন্দ্রাদে আর মাসপলি সেদিন দারুণ খেললেও দলের পরাজয় ঠেকাতে পারেননি।
ফাইনালের আগে হাঙ্গারির ম্যানেজার গুস্তাভ সেবেস বললেন, "আমরা জিতব... যদি না নার্ভাস হয়ে পড়ি।"
পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে আজ পুসকাসই সেদিন প্রথম গোল করেন, আর তার আট মিনিট বাদেই...
জিবর দেন দ্বিতীয় গোল।
জার্মানরা কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলতে থাকেন। এবং মর্লক আর রানের গোলে খেলায় আবার সমতা ফিরে আসে।
পশ্চিম জার্মানি : ২ হাঙ্গারি : ২
হাঙ্গারি তো হতভম্ব। আর তারপরেই ঘটল সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা।
উড়ন্ত ফুটবলকে যেন-বা মন্ত্রবলে আটকে দিয়ে চকিত শটে ফ্রিৎস ওয়াল্টার সেটিকে রানের পায়ে পৌঁছে দিলেন...আর তিল মাত্র দেরি না করে বাঁ-পায়ের দুরন্ত শটে রান সেটিকে পাঠিয়ে দিলেন হাঙ্গারির গোলে।
পশ্চিম জার্মানি বিশ্বকাপ জিতে নিল।
আগামী সংখ্যায় শুরু হবে ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার কাহিনী

দ্ুটোকেই ধরেছি, শেরিফ!
ছেড়ে দাও!
ছেড়ে দাও!
দেখুন মিঃ হল, মানিকজোড় কীভাবে আপনাকে ফাঁকি দিয়ে পালায়!
রোজ রাত্তিরে এই মই বেয়ে তারা সরে পড়ে!
!
একটার পকেটে এই পুরনো নোটটা পেয়েছি!
আমার ছেলেরা খুনী? প্রমাণ কী?
এলাজিকে খুন করেছে! মিঃ সয়ারকেও প্রায় শেষ করে এনেছিল!
মিথ্যা কথা!
প্রমাণ কী?
বেশ, তাহলে প্রমাণ দিচ্ছি!
মিঃ সয়ার, কে আপনাকে গুলি করে তারপর বরফ চাপা দিয়েছিল?
এই দুটি ছেলে।
!
না বাবা, আমরা শিকার করছিলুম!
হঠাৎ ও'র গায়ে গুলি লেগে যায়!
কী মিঃ সয়ার, হঠাৎ?
মোটেই 'হঠাৎ' নয়! আমাকে তাক করে পরপর গুলি চালায় ওরা!
অজ্ঞান হয়ে যেতে ওরা আমাকে বরফ চাপা দেয়।
অ্যাঁ, তোরা এলজিকে মেরেছিস?
মরবে, তা বুঝিনি!
হঠাৎ হয়ে গেছল!
এলজি যে আমাকে খুব ভালবাসত রে!
কী করব এখন?
হায়, হায়, এ আমার ছেলেরা কী করল!
নিজেরা দোষ করে ডনির ঘাড়ে দোষ চাপাবার তালে ছিল!
আমাদের সাজা হবে না!
আমরা তো এখনও ছোট!
হতে পারো ছোট, কিন্তু...
দোষ যখন করেছ, শাস্তি হবেই।
ডনি, তুমি মুক্ত।
ধন্যবাদ, শেরিফ।

(শেষ)

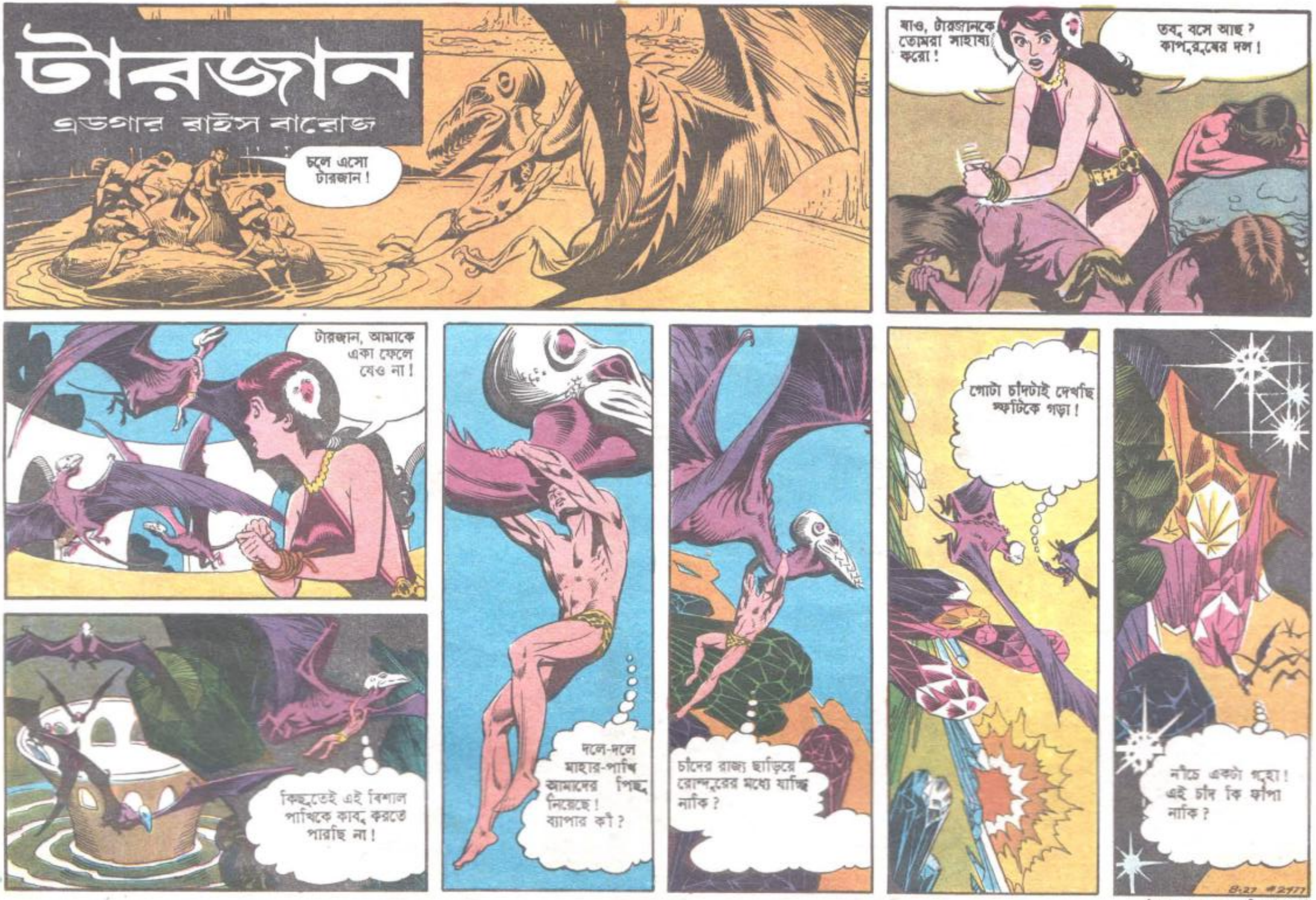

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ২৩ ॥

পূর্ব আফ্রিকা সফরে মোহনবাগান টীমের সঙ্গে আমি মিলিত হলুম তিনটি খেলা হয়ে যাবার পরে। নাইরোবির আম্বাগাছি এয়ারপোর্টের নিউ স্ট্যানলি হোটেলে রাত কাটিয়ে আবার প্লেনে এনটেবি এয়ারপোর্টে পৌঁছে সেখান থেকে কামপালায় গেলুম বাইশ কিলোমিটার পথ মোটরে। উগান্ডার রাজধানী কামপালা। বেশ ছিমছাম সাজানো শহর।

ওখানে পৌঁছতেই আমাদের ম্যানেজার করুণাশঙ্কর ভট্টাচার্য বললেন, "কাণ্ডারীহীন নৌকোটিকে পালের হাওয়ায় এ ক'দিন তো আমরা চালিয়ে নিয়ে এলুম। এবার হাল ধরো।"

মান্নাদা বললেন, "ঠিক সময়েই ক্যাপ্টেন এসে গেছে। সামনেই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ খেলা উগান্ডা প্রভিন্সের সঙ্গে।"

আগের তিনটি খেলায় মোহনবাগান ২—১ গোলে জিতেছে উগান্ডা লায়নস ক্লাবের বিরুদ্ধে, একই ফলে ইস্ট প্রভিন্সের বিরুদ্ধে এবং ৪—০ গোলে হারিয়েছে নর্থ প্রভিন্সকে। "স্ট্যান্ডার্ড কেমন?" জিজ্ঞেস করতেই করুণাদা বললেন,পায়ে জোরালো শট আছে। দেহে আছে লড়াই করার তাগদ। খেলার মধ্যে নাছোড়বান্দা রোখও আছে। একবার কাটিয়েও নিস্তার নেই। যে-খেলোয়াড়টি কেটে যান, তিনিই আবার ফিরে এসে বল কাড়তে চেষ্টা করেন। গতিবেগও ক্ষিপ্র। তবে জোরালো শটের নিশানা যেমন সবসময় ঠিক থাকে না, তেমন বলের সঙ্গে মুভমেন্টেও থাকে না গতির সামঞ্জস্য। বল নিয়ে ছোটাই তো আসল ফুটবল স্পীড। খেলার ধরন অবশ্যই রোবাস্ট এবং সংগ্রামী শক্তি প্রশংসনীয়। ফুটবল সম্পর্কে আগ্রহ আগের চেয়ে শতগুণ বেশি। ইউরোপ থেকে মাঝে মাঝে নানা দল সফরে আসে। তার ফলে আন্তর্জাতিক ফুটবলের টেকনিক ও ট্যাকটিকস রপ্ত করার ইচ্ছে এখন প্রবল। নিষ্ঠাও কম নয়। তোমরা ভাবছ তুড়ি মেরে সব খেলায় জিতে যাবে। তা কিন্তু হবে না। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি খেলায় এরা তোমাদের বেগ দেবে।"

খেলতে-খেলতেই বুঝতে পেরেছিলুম করুণাদার বিশ্লেষণ সত্য। একষট্টি সালেই দেখেছিলুম পূর্ব আফ্রিকার ফুটবলে জোয়ার এসে গেছে। না হলে আমাদের রীতিমত শক্তিশালী দল কি তথাকথিত টেস্ট সিরিজের চারটি খেলার একটিতে হারত! একটি টেস্টে ড্র হত? দুটি টেস্টে আমাদের জয়ও ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে।

এখানে বলা দরকার, টেস্ট কথাটি ক্রিকেট থেকে ধার করে ফুটবল, হকি, ব্যাডমিনটন টেবল টেনিস প্রভৃতি খেলার মধ্যেও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু টেস্ট খেলা হয় একটি দেশের সঙ্গে আর একটি দেশের। কোনো দেশের কোনো ক্লাবের সঙ্গে অন্য কোনো দেশের বা প্রাদেশিক দলের খেলা টেস্ট আখ্যা পেতে পারে না। তবু পূর্ব আফ্রিকার টীম মোহনবাগান ক্লাব দলকে ভারতের জাতীয় দল হিসাবেই ধরে নিয়েছিল এবং সফরের হোতা মহম্মদ আলি হংসরাজ খেলায় বাড়তি মর্যাদা দেবার জন্য চারটি ম্যাচকে টেস্ট ম্যাচ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

মার্চের পাঁচ তারিখে কামপালার নাকিভুবু স্টেডিয়ামে তথাকথিত প্রথম টেস্টে আমরা উগান্ডা প্রভিন্সকে হারিয়েছিলুম ১—০ গোলে। গোলটি করেছিল অমিয় ব্যানার্জি, কলকাতার মাঠে যে 'ডগলাস' নামে পরিচিত ছিল। চমৎকার খেলেছিল উগান্ডা প্রভিন্স। দলটির কোচ, ছিলেন ইংল্যান্ডের এক নামী প্রোফেশনাল ফুটবলার। ষোলোই মার্চ দার-এস-সালামে টাঙ্গানিকার সঙ্গে দ্বিতীয় টেস্টের ফল ছিল সমান-সমান, ১—১ গোল। ওই টেস্টে আমরা কিন্তু কোনো গোলই করতে পারিনি। একটি আত্মঘাতী গোলে টাঙ্গানিকা ০—১ গোলে পিছিয়ে পড়ে। আবার পেনাল্টি কিক পেয়ে তারাই গোলটি শোধ করে দেয়। তৃতীয় টেস্ট খেলাটি হয়েছিল লবঙ্গর দেশ জাঞ্জিবারে মার্চের কুড়ি তারিখে। প্রচুর লবঙ্গ উৎপন্ন হয় জাঞ্জিবারে। তাই নাম আইল অব ক্লোব। আশ্চর্য, সেই খেলায় নাটকীয়ভাবে এগারোটি গোল হয়ে-

পরীক্ষার ফল / নির্ভর করে ভাল পুস্তক নির্বাচনের উপর

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

By 7 teachers

১ মাধ্যমিক প্রাণবিজ্ঞান সহায়িকা
২ মাধ্যমিক জড়বিজ্ঞান সহায়িকা
৩ মাধ্যমিক সংস্কৃত সহায়িকা
৪ মাধ্যমিক ভূগোল সহায়িকা
৫ মাধ্যমিক ইতিহাস সহায়িকা
৬ মাধ্যমিক গণিত সহায়িকা
৭ HELPS TO THE STUDY OF SECONDARY ENGLISH

উপরোক্ত Help Books গুলি

BASED ON GUIDE LINE PUBLISHED IN "পর্ষদবার্তা" BY THE WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION (MONTHLY BASIS)

1 বইগুলি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের "পর্ষদ বার্তা" (GUIDE LINE) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করে, অর্থাৎ (a) OBJECTIVE TYPE, (b) ESSAY TYPE, (c) SHORT ANSWer TYPE, (d) ORAL TEST এই চারিপ্রকার QUESTIONS যথাযথভাবে নিবার্চন করা হয়েছে।

2 প্রথমেই বলতে হয় বইগুলি প্রচুর চিত্রসমৃদ্ধ, তাই একাধারে "TEXT BOOK" ও "HELP BOOK" যে জন্য প্রতিটি পরীক্ষার্থীর কাছে ইহা প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য হবে।

3 মাধ্যমিক শিক্ষকগণ নতুন SYLLABUS অনুসরণ করতে গিয়ে এবং দৈনন্দিন CLASS-এ পড়াতে গিয়ে যে যে অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন সেইদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

4 নবম ও দশম শ্রেণীর সিলেবাসভুক্ত সমস্ত বিষয় (SUBJECT) বিশদভাবে অন্তর্ভুক্ত।

5 প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর স্বয়ংসম্পূর্ণ।

6 উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ,

7 অধ্যায় শেষে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর নির্দেশ ADDITIONAL QUESTIONS & HINTS অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে,

ALLIED BOOK AGENCY

18/A, SHYAMA CHARAN DEY STREET • CALCUTTA-73

ছিল। জাঞ্জিবার বাছাই একাদশকে আমরা হারিয়েছিলুম ৬—৫ গোলে। যে খেলায় একদল ছয়টি, আর একদল পাঁচটি গোল করেছিল তোমরা ভাবছ, সে খেলাটি বুঝি আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের ওঠা-পড়ার ছন্দে দারুণ জমে উঠেছিল। জমেছিল ঠিকই, তবে সেটা আমাদের মধ্যে আত্মতুষ্টির ভাব বেশি করে জমে উঠেছিল বলেই। জাঞ্জিবার দলই প্রথম একটি গোল করে এগিয়ে যায়। আমি সেটি শোধ করে দিই। তারপর চিদানন্দনের দুটি এবং অরুময় ও দীপু দাসের একটি করে গোলে আমরা ৫—১ গোলে এগিয়ে থাকি। কিন্তু খেলায় একটু ঢিলে দেওয়ায় ওরা পর-পর দুটি গোল শোধ করে দেয়। ৫—৩ হওয়ার পর দীপুর আর একটি গোলে ফল দাঁড়ায় ৬—৩। জাঞ্জিবারের খেলোয়াড়রা কিন্তু দমবার পাত্র ছিলেন না। ও'রা আবার দুটি গোল শোধ করে ষষ্ঠ গোলটিও শোধের জন্য যখন বার-বার আমাদের রক্ষণব্যূহে হানা দিতে শুরু করেছেন, তখনই খেলার শেষ বাঁশি বেজে উঠল। কোনোভাবে আমাদের মুখরক্ষা হল।

পঁচিশে মার্চ শেষ এবং চতুর্থ টেস্ট খেলাটি হয়েছিল নাইরোবিতে কিনিয়া দলের সঙ্গে। ওই শেষ টেস্টেই আমরা প্রথম হেরেছিলুম। সফরেও সেই প্রথম পরাজয়। কিনিয়া দল জিতেছিল ৩—১ গোলে। আমাদের গোলটি করেছিল চিদানন্দন। কিনিয়া ছিল সত্যিই শক্তিশালী দল। খেলেছিলও ভাল। তবু বলব, আমাদের বিরুদ্ধে তিনটি গোল হয়েছিল আমাদেরই ত্রুটিতে। গোলকীপার চিত্ত দাশ দূরের একটি শট হাতে ধরেও আঁকড়ে রাখতে পারেনি। হাত থেকে বল মাটিতে পড়তেই কাছে দাঁড়ানো কিনিয়ার এক ফরোয়ার্ড আলতো টোকায় বলটি গোলে ঠেলে দেয়। বাকি দুটি গোল হয় জারনেল সিং গোল করার জন্য জায়গা ছেড়ে এগিয়ে যাওয়ায়। ছকবাঁধা খেলায় স্টপারের একটা গুরুত্বপূর্ণ ও নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। কোনো ফরোয়ার্ডের দায়িত্ব পালনের অক্ষমতা পুষিয়ে নিতে পারে আর একজন ফরোয়ার্ড। লিঙ্কম্যান ও সাইড-ব্যাকের মধ্যেও থাকে পারস্পরিক সাহায্যের সম্পর্ক। কিন্তু স্টপার যদি গোলমুখের অঞ্চলটি উন্মুক্ত রেখে বারবার এগিয়ে যায়, তবে জায়গা খালি পেয়ে সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে আসল কাজটি গুছিয়ে নেবার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে প্রতিপক্ষের ফরোয়ার্ডরা। তা-ই পেয়েছিল। বোধহয় আমরা হেরে যাচ্ছিলুম বলেই অতবড় স্টপার জারনেল বিপদের কথা না-ভেবেই গোল শোধের জন্য এগিয়ে গিয়েছিল। আর সেই ফাঁকেই আরও দুটি গোল করেছিল কিনিয়া। তবে আমরা যে সহজ সুযোগগুলি সৃষ্টি করেছিলুম তার সিকিভাগ কাজে লাগাতে পারলেও হারতুম না। অন্তত চারটি গোল পেতুম। কিনিয়ার ডিফেন্স মরণপণ করে খেলেছিল। কিন্তু ওদের কৃতিত্বের চেয়ে বড় হয়ে ফুটে উঠেছিল আমাদের ব্যর্থতা।

সফরের শেষ মুখে, বিশেষ করে টেস্ট আখ্যাপ্রাপ্ত খেলায় হেরে গিয়ে আমরা বেশ মুষড়ে পড়েছিলুম। পরে কিনিয়া কলোনির ছোট্ট শহর নাকুরুতে এক নৈশ ফুটবলে আমরা ৩—৫ গোলে হেরে গিয়েছিলুম রাইফেল ভ্যালি দলের কাছে। এ-খেলাটির আগেই চিদানন্দন বোম্বাই চলে যায় বি. কম পরীক্ষায় বসার জন্য। অনেকেই জানে না যে, চিদানন্দনের আদি বাড়ি ছিল পূর্ব আফ্রিকায়। দার-এস-সালামে শৈশব কাটিয়ে বোম্বাইয়ে চলে যায়। সেখানেই তার ফুটবলে প্রতিষ্ঠা। পরে যোগ দেয় মোহনবাগানে। রাইফেল ভ্যালির বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিল অমিয় ব্যানার্জি। যে খেলায় আমরা পাঁচটি গোল খেয়েছিলুম, সে-খেলায় হ্যাটট্রিক নিয়ে গর্ব করার আর কী আছে? এ-খেলায় আমি যোগ দিইনি। টেস্টে হেরে যাওয়ায় তখন আর আমার খেলতে ভাল লাগছিল না।

অন্যান্য খেলার কথা বলতে গেলে লেখা বড় হয়ে যাবে। তবু কিছু কিছু বলব বইকী। প্রায় দুমাসের সফরে অনেক মজার ঘটনাও ঘটেছে।

আফ্রিকাকে বলা হত পৃথিবীর শ্বাপদ-সঙ্কুল এবং আরণ্যক মহাদেশ। অন্ধকারাচ্ছন্ন। হরেক রকমের হিংস্র প্রাণী এবং গহন অরণ্য অবশ্যই দেখেছি কিন্তু অন্ধকার দেখিনি। বরং দেখেছি আলোর রোশনাই। আমরা যখন গিয়েছিলুম তখন পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার জন্য মানুষ মরিয়া হয়ে উঠেছে। জোমো কেনিয়াট্টার নেতৃত্বে শুরু হয়ে গেছে 'মাউ মাউ' আন্দোলন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছোঁয়া লেগেছে সর্বত্র।

নাইরোবির কথাই বলা যাক। পশ্চিমি

ঢঙে সাজানো শহর। ছিমছাম রাস্তাঘাট। তখন লোকসংখ্যা ছিল আড়াই লাখের মতো। তার মধ্যে হাজার পঞ্চাশেক ভারতীয়। বেশ কিছু বাঙালিও ছিলেন। শহরে অসংখ্য মোটর গাড়ি। শুনেছিলুম মোটরের সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে নাইরোবির মর্যাদা পৃথিবীতে দ্বিতীয়, নিউ ইয়র্কের পরে। প্রতি তিনজনের একখানা করে গাড়ি আছে। শহরে প্রাচুর্যের ছাপ, কিন্তু অহমিকার চিহ্ন নেই। আতিথেয়তায় নেই কণামাত্র কুণ্ঠা। সর্বত্রই আমরা উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছিলুম। বেশির ভাগ শহরেই আমাদের রাখা হয়েছিল ভাগ-ভাগ করে সম্পন্ন গৃহস্বামীর আশ্রয়ে। একসঙ্গে হোটেলে নয়। দুজন হয়তো থাকত কোনো মহম্মদ আলির বাড়িতে, দুজন কোনো মেহতার আলয়ে, দুজন কোনো সুব্রহ্মনিয়ামের আশ্রয়ে বা কোনো সিংজীর ডেরায় কিংবা কোনো বসু বা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। গেটের সামনেই মোটর গাড়ি।

তবে নিয়ম ছিল, গাড়ি চালাতে হলে ওখানে টেম্পোরারি লাইসেন্স করে নিতে হবে। আমার দাদা মানিক গোস্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে চুপি-চুপি ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন করলুম। পুলিস-প্রধানের কাছ থেকে অচিরেই ডাক এল। রবার্টসন না কী নাম ছিল তাঁর আজ ঠিক মনে করতে পারছি না। তিনি বললেন, "তোমরা কোন্ শহরের লোক? আগে কোথায় গাড়ি চালিয়েছ?"

বললুম, ''আমাদের শহরেই চালিয়েছি। আমরা কলকাতা থেকে আসছি।''

পুলিস কমিশনার মজার গলায় যা বললেন তার বাংলা হল এইরকম : ''তোমরা কলকাতার লোক, তার মানে বড়বাজার এলাকাতেও গাড়ি চালাবার অভিজ্ঞতা আছে। ব্যস, চিন্তার কোনো কারণ নেই, তোমরা পৃথিবীর যে-কোনো রাস্তাতেই গাড়ি চালাতে পারবে স্বচ্ছন্দে।''

টেম্পোরারি ড্রাইভিং লাইসেন্স মঞ্জুর হয়ে গেল আমাদের নামে।

পুলিস কমিশনার বললেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি কলকাতায় ছিলেন এবং ঘিঞ্জি বড়বাজার সম্পর্কে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে।

(ক্রমশ)

উদয়ন-বাড়ি থেকে অসুস্থ কবিকে নামিয়ে আনা হচ্ছে

শান্তিনিকেতন থেকে শেষ বিদায়

অপর্ণা ভট্টাচার্য

সেদিনটি ছিল শুক্রবার, ১৯৪১ সালের ২৫ জুলাই; বাংলা ৯ শ্রাবণ ১৩৪৮। শান্তিনিকেতনে সেদিন আশ্রমে যাঁরা ছিলেন, কে জানতেন, সেই যাওয়াই ছিল তাঁর শেষ বিদায়যাত্রা! আশ্রমের আবালবৃদ্ধ সকলে একে একে এসে মিলিত হয়েছিলেন উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে—বিষণ্ণব্যাকুল চিত্তে, ভারাক্রান্ত মনে, নীরবে। আজ সকালের পাকুড় প্যাসেঞ্জারে অসুস্থ গুরুদেবকে অস্ত্রোপচারের জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে—এ-কথা সেদিন শান্তিনিকেতনে কার না জানা ছিল!

অসুস্থতার কারণে কবির শরীর কিছু-দিন ধরেই বেশ খারাপ যাচ্ছিল। প্রতিদিনই জ্বর আসত— ৯৯°, ১০০°, কোনোদিন বা ১০১°। খাওয়া-দাওয়া কমে গিয়েছিল একেবারেই। কোনো কিছুই খেতে ইচ্ছে করত না। শরীর তাই ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। শেষে চলা বা দাঁড়ানোর শক্তিও আর ছিল না।

এ অবস্থা থেকে কবিকে রক্ষা করতে গেলে অপারেশন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ১৪ জুলাই সকালের গাড়িতে কলকাতা থেকে এক দল চিকিৎসক এলেন কবিকে দেখতে এবং অপারেশনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে। এলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার ইন্দুভূষণ বসু এবং পরিবারের বন্ধু ডাক্তার জ্যোতিপ্রকাশ সরকার। কবিকে বহুক্ষণ পরীক্ষা করে ডাক্তাররা স্থির করলেন—কলকাতায় নিয়ে গিয়ে, অবিলম্বে অপারেশন করতে হবে।

নিজের দেহটার উপর অস্ত্রাঘাতে কবির একেবারেই সম্মতি ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অপারেশনের রায় তাঁকে মেনে নিতেই হল।

বিকেলের গাড়িতে ডাক্তারের দল কলকাতায় ফিরে গেলেন। ১৬ তারিখের কাগজে বড় হরফে বেরুল—'রবীন্দ্রনাথের অবস্থা উদ্বেগজনক প্রয়োজন হইলে কলিকাতায় আনা হইবে।'

২৪-এর সকাল থেকেই কবিকে বেশ কিছুটা চঞ্চল দেখাচ্ছিল। পরদিন কলকাতায় রওনা হতে হবে; সবকিছু ঠিক-মতো গোছগাছ হল কিনা এ-নিয়ে কবি একেবারে ছেলেমানুষের মতো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বনমালীকে ডেকে বললেন—তুই তো কিছুদিন ছিলি না, জিনিসপত্র কোথায় কী গেছে, ঠিক করে দেখেশুনে নিস কিন্তু আমার যা-যা লাগে।

এদিন বিকেলের গাড়িতে রথীন্দ্রনাথ ও অনিল চন্দ কলকাতায় চলে গেলেন—সেখানকার ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আগে থেকে খোঁজ-খবর নেবার জন্য।

২৪-এর সন্ধ্যায় ইস্ট ইন্ডিয়া রেলের

ছোটদের যত সেরা বই

শৈলেন ঘোষ এ-কালের একমাত্র সফল শিশু-সাহিত্যিক, যিনি বাংলা রূপকথার আবহমান ধারাটিকে একক প্রচেষ্টায় বহন করে চলেছেন। তাঁর চরিত্ররা কেউই অচেনা নয়, কিন্তু তাদের নিয়ে যে-ভঙ্গিতে তিনি গল্প বলেন সেই ভঙ্গিতে মিশে থাকে রূপকথার এক অপরূপ মেজাজ। ঠিক এই মেজাজে এখনকার কোনো সাহিত্যিক ছোটদের জন্য লেখেন বলে মনেই পড়ে না। মানুষ, বাঘ, বাঁদরছানা, ডাইনিবুড়ি, কুমির, পাখি, মাছ, নদী—এরা সবাই তাঁর গল্পে অবাক-করা চরিত্র। দক্ষিণারঞ্জন বা অবন ঠাকুর—এরাই তাঁর আদর্শ, এঁদের ঐতিহ্যেরই উত্তরসূরী তিনি।

পাপু তোমাদেরই এক ছোট্ট বন্ধুর নাম। মাত্র আট বছর ন মাস বেঁচে-ছিল সে এই পৃথিবীতে। আর সেই পলকটুকুতে খেলাচ্ছলে যে-কল্পলোকের দুয়ার সে খুলে দিয়েছিল, তারই এক ঝলক 'পাপুর বই।' পাপুর আঁকা অজস্র ছবি এবং তাঁর লেখা প্রচুর কবিতা-গল্প-নাটক নিয়ে এই বই। পাপুর আঁকা ছবি নিয়ে আরেকটি বই—'পাপুর ছবি, সঙ্গে ছড়া।'

পাপুর আঁকা ছবির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নানা স্বাদের ছড়া লিখেছেন বাংলা দেশের নামজাদা সব সাহিত্যিকরা। যেমন দুর্ধর্ষ ছড়া, তেমনই আশ্চর্য ছবি। বইটি সম্পাদনা করেছেন রমাপদ চৌধুরী।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভয়ংকর সুন্দর ৫ সবুজ দ্বীপের রাজপুত্র ৫ তিন নম্বর চোখ ৫ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৬ সবুজ দ্বীপের রাজা ৫ ভুংগা ও জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ১০ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৬ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬ সমগ্র কিশোর সাহিত্য (১ম) ২০ **প্রেমেন্দ্র মিত্রের** আগ্রা যখন টলমল ৫ যাঁর নাম ঘনাদা ৫ ঘনাদার ফুঁ ৬ তেল দেবেন ঘনাদা ৫ **শৈলেন ঘোষের** অরুণ বরুণ কিরণ-মালা ৩ মিতুল নামে পুতুলটি ৪ ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬ বাজনা ৬ হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫ আমার নাম টায়রা ৫ আজব বাঘের আজগুবি ৭ **হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের** ভয়ের মুখোশ ৬ পাথরের চোখ ৬ সীমানা ছাড়িয়ে ৬ পাঁচ মুণ্ডির আসর ৬ **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের** ভূমিকম্পের পটভূমি ৪ **ইন্দ্রমিত্রের** বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫ শরৎ কথামালা ১০ **সত্যজিৎ রায়ের** প্রোফেসর শঙ্কুর আজব অ্যাডভেনচার: প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৬ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬ মহাসংকটে শঙ্কু ৬ **পূর্ণেন্দু পত্রীর** কী করে কলকাতা হলো ৪ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪ **শঙ্করীপ্রসাদ বসুর** আমাদের নিবেদিতা ৬ **মৌমাছির** রাজার রাজা ৭ **সরলাবালা সরকারের** পিনকুর ডাইরি ৩ **সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের** ছেলে-দের বিবেকানন্দ ২ **পাপু (সুব্রত সরকার)র** পাপুর বই ৬ পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫ **পার্থ-সারথি চক্রবর্তীর** কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা ৪ রসায়নের ভেল্কি ৩ ম্যাজিকের মতো মজা ৫ তত **সহজ ছিল** না ৫ **সুকুমার রায়ের** সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ১ম ২৫ ২য় ৩০ **জীবজন্তু** ৮ সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০ **বুদ্ধদেব গুহর** ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫ মউলির রাত ৫ **ধনীগোপাল চক্রবর্তীর** চরকাবুড়ি ৪ যাদু-ঘরে চল যাই ৬ **মতি নন্দীর** ননীদা নট আউট ৪ স্ট্রাইকার ৬ স্টপার ১০ কোনি ৭ **বিমল করের** ওআণ্ডার মামা ৬ কাপালিকরা এখনও আছে ৭ রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য ১০ **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিমল দাসের** সাদা বাঘ ১০ **অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর** শাদা ঘোড়া ৮ **অজেয় রায়ের** ফেরোমন ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬ **গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও মন্মথ চৌধুরীর** নিশীথ রাতের আহ্বান ৩ **গৌর-কিশোর ঘোষের** দুষ্টু দুপুর ৪ **আনন্দ বাগচীর** বনের খাঁচায় ৬ **মনোজ বসুর** ওস্তাদ নটবর ৬ **শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক ৪ **শিশির করের** গঙ্গায় বাঘ ৪ **লীলা মজুমদারের** বাতাসবাড়ি ৪ **অমরনাথ রায়ের** দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী ১০ **আশাপূর্ণা দেবীর** রাজ-কুমারের পোশাকে ৪ **সমরেশ বসুর** মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৬ **অমিতাভ চৌধুরীর** তেপান্তরের মাঠে ৪

অধিকর্তা নিবারণচন্দ্র ঘোষ তাঁর নিজের সেলুন-কার নিয়ে বোলপুর স্টেশনে এসে পৌঁছলেন। এই সেলুনে করেই পরদিন সকালে কবিকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে।

২৫ জুলাই ভোর চারটের সময়েই দেখা গেল, পূর্বদিকের জানালার কাছে কবি পোশাক-পরিচ্ছদ পরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। দেখতে দেখতে আশ্রমের সবাই এসে জড়ো হল উত্তরায়ণের লাল কাঁকরের বিরাট প্রাঙ্গণে।

ধীরে ধীরে তাঁকে নীচে নামিয়ে আনা হল। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। উদয়নের দরজার সামনেই কবির জন্য আশ্রমের নীল রঙের বাসটি দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁকে অতি সাবধানে চেয়ারে বসিয়েই বাসের পেছনের দরজা দিয়ে গাড়ির মধ্যে তোলা হল। কবি দু দিন আগেই খুব ছোট করে চুল কেটেছিলেন, তাই তাঁকে যাবার দিনটিতে খুবই রোগা দেখাচ্ছিল। তাঁর চোখে ছিল গোল কালো চশমা—তাতে তাঁকে আরও বিষণ্ণ ও ক্লান্ত লাগছিল। যাবার আগে আশ্রমবাসীর উদ্দেশে কবি যে দুটি কথা বলে যাবেন তাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার সৌভাগ্যও আশ্রম-বাসীর সেদিন ঘটল না। গাড়ির পথের দুই ধারে লাইন করে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দর্শনপ্রার্থীর দল। আশ্রমের মানুষ সেদিন তাঁদের প্রিয় গুরুদেবকে নীরব শ্রদ্ধা ও বিদায়-অভিবাদন জানাল। কিন্তু কবির গাড়িটি যে-মুহূর্তে যাত্রা শুরু করল, তখনই যেন মেঘ ভেঙে বৃষ্টি নামার মতো হাজার কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত কান্না অকস্মাৎ গান হয়ে ঝড়ে পড়ল—

আমাদের শান্তিনিকেতন।
সে যে সব হতে আপন...

এ গানের সুর কবির কানে গিয়ে পৌঁছল। দেখা গেল, বিদায়মুহূর্তে রোগক্লান্ত আশ্রম-পিতার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

সেদিন কবির রথের যিনি সারথি ছিলেন, তাঁর নাম নীলমণি গায়েন। তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণঃ গাড়ি আশ্রম থেকে বড় রাস্তায় এসে থামল। অসম্ভব খারাপ পথ। সমস্ত মন-প্রাণ এক করে স্টীয়ারিং আঁকড়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছি। যেন এতটুকু না দোলে গাড়ি, যেন গুরুদেবের কণ্ট না হয়। কিন্তু তাঁর অসম্ভব কষ্ট, গাড়ি কখনো একটুখানি দুলে ওঠে আর তাঁর মুখটা যেন নীল হয়ে যায় যন্ত্রণায়। এত কষ্ট হতে লাগল আমার, কিন্তু আমি আর কিছুই করতে পারি না! এক সময় গাড়ি থামিয়ে গুরুদেবের মুখের দিকে চেয়ে বললাম—আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে? গুরুদেব হেসে বললেন—'না না, আমার কষ্ট কিসের? নীলমণি যার রথের সারথি তার আবার ভাবনা কী? তুমি চালাও।'

হাওড়া স্টেশনে ২-৪০ মিনিটে গাড়ি এসে পৌঁছল। কবি কলকাতায় কোন্ ট্রেনে আসছেন সে সংবাদ সর্বসাধারণের কাছে তাঁর শরীরের দিকে লক্ষ রেখেই গোপন রাখা হয়েছিল। তাই স্টেশনে কোনো ভিড় ছিল না। তাঁর জন্য ট্রেনের কামরায় স্বাচ্ছন্দ্যের সব রকম ব্যবস্থাই ছিল, তবুও দুপুরের অত্যধিক গরমে এই অসুস্থ শরীরে পৌনে সাত ঘণ্টার রেল-ধকলে কবিকে খুব ক্লান্ত, দুর্বল দেখাচ্ছিল। হাওড়া স্টেশনে তাঁকে যখন স্ট্রেচারে করে নামানো হচ্ছিল, তখন মনে হয়েছিল—শেষবিদায়ের দিনটি বুঝি আসন্ন। স্টেশনে তাঁর জন্য বিশেষ মোটর গাড়ির ব্যবস্থা ছিল। তাঁকে সেই গাড়িতে তোলা হল। ৩-১৫ মিনিটের সময় কবি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে পৌঁছলেন।

জোড়াসাঁকোর পুরনো বাড়ির দোতলায় 'পাথরের ঘরে' তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অপারেশন হবে বলে আগে থেকে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল — এমনকী, দু দিকের দেওয়ালে দেবেন্দ্রনাথ ও দ্বারকানাথের দুটি ছবি ছিল, তাও খুলে নেওয়া হয়েছিল। বিকেলে যে দু-একজন দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কবি বেশি কথা বলতে পারেননি। সন্ধের দিকে ওই স্ট্রেচারে শুয়েই বেশ খানিকক্ষণ ঘুমোলেন। ঘুম ভাঙার পর এক সময় আপন মনেই বললেন, কী জানি, ভালো লাগছে না যেন আমার।

কলকাতার লোক তখনও জানে না গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ মহানগরীতে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনের মানুষ—যাঁরা কবিকে প্রত্যূষে বিদায় জানিয়েছেন, তাঁদের মনটি ছিল সারাদিন বিমর্ষ, বিষাদে আচ্ছন্ন, ভারাক্রান্ত; 'আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার।' (ছবি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে)

১		২	৩	■	৪	
	■	৫				■
৬	৭	■		■	■	■
৮			■	৯	১০	১১
■	■	■	১২	■	১৩	
■	১৪			১৫	■	
১৬		■	১৭			

সংকেত পাশাপাশি : (১) বৈদিক ঋষি। (৪) প্রাণ। (৫) এক প্রাচীন ধর্মপ্রচারক। (৬) চিনি যোগায় যে-চিন্তামণি। (৮) ভয়ংকর স্থান (৯) সুগন্ধি দ্রব্য। (১৩) একাধারে খাদ্য ও পানীয়— শুধু একটু বদনাম আছে। (১৪) শহুরে, ব্যাপক অর্থে দেশের মানুষ। (১৬) পাখি। (১৭) একটি গিরিপথ।

উপর-নীচ (১) যাযাবর জাতি। (২) অলংকার-শাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দ। (৩) বন্দিনী সীতার ব্যথার ব্যথী। (৪) প্রাণহানিও ঘটায়, আবার প্রাণ রক্ষাও করে। (৭) অস্ত্র-বিশেষ, জন্তুর দেহাংশই বা নয় কেন! (১০) একটি দেশের রাজ-ধানী। (১১) সাবেকি বাড়িতে থাকে, নাম শুনে মনে হয় পাখি-টাখি। (১২) দুর্গ বা নগর-রক্ষী। (১৪) সাপ মানে যখন হাতি। (১৫) প্রবাদ, এই মাছ নাকি রাঁধুনীকেও চিনে রাখে।

সমাধান আগামী সংখ্যায়.

গত সংখ্যার সমাধান

ত্রি	শ	ঙ্কু	■	গো	ক্ষু	র
■	হি	■	বি	■	র	■
হু	দ	■	ক্র	■	প্র	স্থ
■	■	দা	মা	মা	■	■
নি	শি	■	দি	■	গা	মা
■	খ	■	ত্য	■	লি	■
গা	ণ্ডী	ব	■	শ্র	ব	ণা

ছোট্‌কা গিয়েছিল বিয়ের বাজার করতে। এক জ্যাঠতুতো বোনের বিয়ে। সেই বিয়ের বাজারে।

এদিকে ধাঁধা শেষ বলে আমি সেই বিকেল থেকে বসে আছি। ছোট্‌কার আর দেখা নেই।

সন্ধে পার করে ছোট্‌কা ফিরল। তাও কি সরাসরি ঘরে ফিরবার জো আছে! পুরো বাজার দেখতে দোতলায় তখন ভিড় ভেঙে পড়েছে। এটা কত, ওটা কত, এটা কেমন, ওটা কেমন—হাজার রকমের প্রশ্ন আর মন্তব্য।

ছোট্‌কা ঘরে ফিরেই আমাকে

দেখে বলল, "সতুবাবুর ধাঁধা একেবারে রেডি। কতক্ষণ বসে আছ সতুবাবু ?"

"সেই বিকেল থেকে।" আমি ক্ষুণ্ণ গলায় জবাব দিলাম।

"তাহলে তো জব্বর একখানা ধাঁধা দিতে হয়"। ছোটকা গায়ের জামাটা খুলে হ্যাঙ্গারে ঝোলাতে-ঝোলাতে বলল, "বিয়েবাড়ির বাজার নিয়ে ধাঁধা। নাও, লিখে ফেল চটপট।" বলেই আমার দিকে দুটো বাবুলে গাম ছুঁড়ে দিল। আমি লিখতে শুরু করলাম।

প্রথম ধাঁধা ॥ একশো টাকার কিছু আর কুড়ি টাকার কিছু নোট মিলিয়ে প্রায় হাজার দেড়েক টাকা নিয়ে বাজারে গিয়েছেন এক ভদ্রলোক। বাজার সেরে যখন ফিরলেন, তখন তাঁর পকেটে ফিরল যত টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলেন তার ঠিক তিন ভাগের এক ভাগ টাকা। আর কী আশ্চর্য একশো টাকার নোট আর কুড়ি টাকার নোট যেমন-যেমন নিয়ে গিয়েছিলেন ফেরার পর দেখা গেল ঠিক তার উল্টো রকম রয়েছে পকেটে। অর্থাৎ বেরোবার সময় যে-কটা একশো টাকার নোট ছিল পকেটে এখন রয়েছে ঠিক ততগুলো কুড়ি টাকার নোট, আর যে-কটা কুড়ি টাকার নোট নিয়ে বেরিয়েছিলেন এখন পকেটে রয়েছে সে-কটা একশো টাকার নোট।

কত টাকা বাজারে খরচ করলেন ভদ্রলোক ? কত নিয়ে গিয়েছিলেন, ফিরলেনই বা কত নিয়ে ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ দুটো কড়াই। একই রকম দেখতে আর সমান পুরু। একটার চাইতে অন্যটার আট গুণ বেশি জিনিস ধরে। বড়টার ওজন ছোট কড়াইটার থেকে কত গুণ বেশি ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ প্রশ্নের উত্তরে কখনোই হাঁ বলা যায় না ?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ উপযুক্ত সংখ্যা বসাও—

৮৯ ৭২ ১৪ ?

গতবারের উত্তর ॥ (১) ১২০টা টুকরোয় প্রথমে ২৪টা সিগারেট নতুন করে হবে। এই চব্বিশটাও টুকরো হয়ে যাবে। সেই অবশিষ্ট ২৪ টুকরো আর ১ টুকরো (১২১ টুকরো ছিল) দিয়ে পাঁচটি, এবং এই পাঁচটির ধ্বংসাবশেষ দিয়ে নতুন করে একটি সিগারেট তৈরি করা যাবে। অর্থাৎ মোট ৩০টি সিগারেট হবে। (২) ৯+৮+৭+৬৫+৪+৩+২+১=৯৯ (অন্য উত্তরও হয়) (৩) শক্ত হয়েই থাকবে তেপায়া (৪) টাইম-টেবিল।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

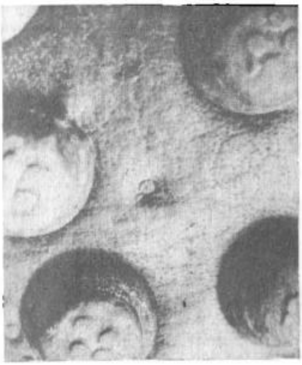

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল ঢাকের ছবি
ফোটো তপন দাস

উত্তর বটে

প্রঃ ফোটোগ্রাফারের ডার্করুমে দরজা জানালা বন্ধ রাখতে হয় কেন?

উঃ বাঃ, খুলে রাখলে যে অন্ধকার সব বেরিয়ে যাবে।

প্রঃ রাম আর শ্যাম দুজনে কাছাকাছি জায়গায় বসে কমলালেবু বিক্রি করছে, টাকায় চারটে করে। হঠাৎ এক সময়ে শ্যাম খদ্দের বাড়াবার জন্যে টাকায় ৬টা করে লেবু দিতে শুরু করল। রাম তখন কী করবে?

উঃ শ্যামের কাছ থেকে লেবু কিনে খাবে।

প্রঃ তিনতলার জানলা দিয়ে যদি হঠাৎ দেখতে পাই, বারোতলার জানলা থেকে একটা লোক নীচে পড়ে যাচ্ছে, আমার তখন কী করণীয়?

উঃ তাড়াতাড়ি সৎকার সমিতিতে একটা টেলিফোন করা।

প্রঃ ডিকশনারি বানান লিখতে N-এর পরে A হবে, না E?

উঃ আমি ঠিক জানি না, ডিকশনারি খুলে দেখে নাও।

সুসেন

মজার খেলা

এ খেলাটা খেলা যায় অনেকে মিলে, বেশ জমিয়ে। এ-খেলায় কোনো চালাকির ব্যাপার নেই, কিন্তু তবু বেশ মজাদার।

বন্ধুদের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে যে খেলাটায় প্রথমে অংশ নেবে। পরে অন্য বন্ধুরাও একে-একে অংশ নেবে। যে-বন্ধু প্রথমে অংশ নেবে, পুরো ঘরটা পাঁচ মিনিট ধরে তাকে ভাল করে দেখে নিতে বলো। এর পর সে ঘরের বাইরে যাবে। আর সেই অবসরে তোমরা ঘরের মধ্যে কিছু-কিছু জিনিসপত্র এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে রাখবে।

কোন্-কোন্ জিনিসপত্র সরানো হল, তার একটা তালিকাও তোমরা করে নেবে। সব হয়ে গেলে বাইরে থেকে বন্ধুটিকে ফের ঘরে ডেকে

আনো। বন্ধুটি ফিরে এসে পুরো ঘরটা আরেকবার ভাল করে দেখবে। তারপর বলতে শুরু করবে, কী-কী জিনিসপত্র ইতিমধ্যে অদল বদল করে রাখা হয়েছে। ইচ্ছে করলে তাকে কাগজ কলম ও পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারো, সে লিখেও ফেলতে পারে।

এবার তোমাদের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখো, কত দূর ঠিক-ঠাক বলল সে।

যে-বন্ধু সব থেকে বেশি সঠিক উত্তর দেবে, সেই জিতবে এই খেলাটায়।

মজারু

হাসিখুশি

একটা কালো পাথরের কুকুর ছিল এক জনের টেবিলের উপরে। ঘরে এক আগন্তুক এসে পরিহাস করে জানতে চাইলেন, "এই কুকুরটাকে কখন-কখন খেতে দাও?" কুকুরের মালিক বলল, "যখনই কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে, ঠিক তখন।"

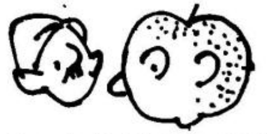

কোনো ফলওয়ালার ছেলের অঙ্কের শিক্ষক অঙ্ক শেখাচ্ছিলেন, "মনে করো, তোমার বাবা যদি দুশো কমলালেবু টাকায় পঁচিশটা করে বেচেন, কত টাকা হবে?"

ছেলেটি অম্লানবদনে উত্তর দিল, "যত টাকাই হোক, টাকায় পঁচিশটা করে কমলালেবু বেচলে আমরা নির্ঘাত না খেয়ে থাকব।"

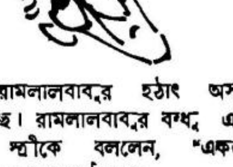

রামলালবাবুর হঠাৎ অসুখ হয়েছে। রামলালবাবুর বন্ধু এসে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "একজন ডাক্তারকে খবর দিন।"

রামলালবাবুর স্ত্রী বললেন "একজন ডাক্তার কী বলছেন? সাত জন ডাক্তারকে খবর দিয়েছি।"

"সাতজন! সাতজন ডাক্তার কী করবে?" অবাক হয়ে গেলেন রামলালবাবুর বন্ধু।

রামলালবাবুর স্ত্রী বললেন, "যাতে দেরি না হয়ে যায় তাই সাত জনকেই ডেকেছি, যে আগে আসবে শুধু তাকে ভিজিট দেব।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

কলকাতাতে বান

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

বিষ্টি পড়ে টুপ্ টুপা টুপ্
কলকাতাতে বান,
ঝাঁকামুটের ঝাঁকায় চেপে
তিনটি বাবু যান।
একটি বাবু বগল বাজান
এক বাবু গায় গান,
আর এক বাবু নাচতে উঠে
ডিগবাজি এক খান।
টুপ টুপা টুপ্ বিষ্টি পড়ে
কলকাতাতে বান!

ছবি দেবাশিস দেব

জানার বিষয়

রঞ্জন ভাদুড়ী

আটাকামা মরুভূমি, টিটিকাকা হ্রদ ;
সব নদী নদী নয়, কেউ-কেউ নদ ;
আন্দিজ পর্বত, মিকির পাহাড় ;
কোন্ বনে দেখা যায় পাইন আর ফার ;
কোন্ বনে জন্মায় উইলো সেগুন ;
কাকে বলে গ্লেসিয়ার, কোন্‌টা লেগুন ;
আগ্নেয়গিরি কেন আগুন ছড়ায় ;
বাসুকির ফণা কেন পৃথিবী নড়ায় ;
কোন্ কোন্ সমুদ্রে ওঠে টাইফুন ;
কোথায় গোরিলা থাকে, কোথায় বেবুন ;
টর্নেডো-হারিকেনে কতটা তফাত ;
সবচেয়ে উঁচু কোন্ জলপ্রপাত ;
রাতেও সূর্য কোথা উঁকি দিয়ে যায় ;
কোন্ জাতি কথা বলে বান্টু ভাষায়—
এই-সব ভূগোলের জানার বিষয়,
জেনে নিলে বুদ্ধিটা খোলতাই হয়।

ভুতুড়ে কুকুর

আশাপূর্ণা দেবী

আগে যা ঘটেছে

ব্রজাঙ্গসুন্দর বৈকালিক ভ্রমণ সেরে বাড়িতে ফিরে একটি বেওয়ারিশ অ্যালসেশিয়ান দেখতে পান। খাবার দিতে গিয়ে দেখেন, কুকুরটি বেপাত্তা। এদিকে, আলমারির গোপন গহ্বর থেকে তাঁর 'কথাসর্বস্ব' উধাও। জ্যোতিষী বলেন, বাড়ির ভৃত্য ফটিক চোর। পরদিন দেখা যায়, ফটিক আত্মহত্যা করেছে। বাড়িতে পুলিস। তারপর বাড়ির ছোট্ট ছেলে রিংকুও ফটিকের পথ ধরে। কলকাতার বাইরে ভন্টা, হর্তুকি আর তোরাপের ষড়যন্ত্রটাই বা কিসের? ওদিকে, চোরের সর্দার ভন্টার আস্তানার কাছাকাছি ভাঙাচোরা একটা শিবমন্দিরে এসে জুটেছে ছদ্মবেশী দুই তরুণ সাধু। তারা ভন্টাদের গোপন পরামর্শ শুনে ফেলে গোড়েভোম্বলপুরের নতুন বাড়ির কর্তা নরহরি শিকদারকে সাবধান করে দেয় রহস্য করে। এদিকে, চোরের ওপর বাটপাড়ি হওয়ার জন্যে ভন্টা, হর্তুকি আর তোরাপের মধ্যে ভুল বোঝা-বুঝি হয়। তার পরেই পুলিস এসে গ্রেফতার করে পাকা চোরদের। কিন্তু, পুলিসকে খবরটা দিল কে? বাড়ি ফিরে এসেছে হারানো রিংকু আর ফটিক। রিংকু বেরিয়ে এল অ্যালসেশিয়ানের খোলস থেকে। সারা বাড়ি হৈ-হৈ করে উঠল ওদের দেখে, কিন্তু কোথায় ছিল ওরা এতদিন?

১২

'বারণ করা'টি যত সহজ, বারণ মান্যটি কি তত সহজ?

রিংকুকে কেউ আর কিছু জিজ্ঞেস না করুক, রিংকুই তো জিজ্ঞেস করতে শুরু করে দেয় দুধের গেলাস হাতে, "মা! চাদর তুলে যখন দেখলে—আমি নয়, পাশবালিশ, কী করলে তুমি?''

মা কিছু বলার আগেই রিংকুর বাবা উত্তর দিয়ে দেন, ''দু'হাত তুলে নাচলেন। শুধু তোমার মা কেন, বাড়ির সবাই! হুঃ। দুধটা খা।''

এক চুমুক দুধ খেয়ে আবার কথা—''মাকড়সার—ইয়ে ফটিকদার মড়াটা—কী রকম দেখতে হয়েছিল বাপী?''

''ফার্স্ট ক্লাস! ফটিক, তুই থিয়েটার কোম্পানিতে মেকআপ ম্যানের চাকরি পেতে পারিস। পাশবালিশে যা একখানা মড়ার মেক আপ দিয়েছিলি। উঃ! রাতারাতি মোজার মধ্যে তুলো ভরে পা বানালি কখন?''

ফটিককে এখন একটু চটপটে লাগছে। কারণ এখন ফটিক নিজের শার্ট প্যান্ট পরেছে। তাই বেশ চটপটই উত্তর দেয়, ''ও তো আগে থেকেই বানানো হচ্ছিল। ওই চিলেঘরেই তো রাজ্যির পুরনো লেপ-তোশক জমানো।''

সুমনা অবাক হয়ে বলে, ''কিন্তু এসব করতে গেলি কেন?''

ফটিক দুধটা চোঁ-চোঁ করে শেষ করে বলে, ''বঙ্কাদার—ইয়ে মানে খোকাদাদাবাবুর প্ল্যান।''

গৌরাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, ''বঙ্কাদা, মাকড়সা—এসব আবার কী কথা রে?''

ফটিক রিংকুর দিকে তাকিয়ে বলে, ''বলব?''

রিংকু আধ গেলাস দুধসুদ্ধ গেলাসটা নামিয়ে রেখে টান-টান গলায় বলে, ''বলবি না কেন? আমরা কিছু দোষ করেছি? ওগুলো হচ্ছে ছদ্মনাম। ওর নাম মাকড়সা, আমার নাম বঙ্কাদা! অবশ্য অনেক সময় গুরু-চ্যালাও হতে হয়েছে।''

সুমনা বেচারি ভাবে, হঠাৎ 'বাড়ি থেকে পালানো'র অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়ে কি তার ছেলের মাথার গোলমাল হয়ে গেল। কী বলছে সব। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, ''কেন হতে হয়েছে?''

রিংকু আরও টানটান গলায় বলে ওঠে, ''গোয়েন্দাদের ওরকম হতে হয়। তাদের দুটো চারটে ছদ্মনাম থাকতেই হয়। না থাকলে চলে না।''

''গো-য়ে-ন্দা! গোয়েন্দা মানে?''

"গোয়েন্দা মানে গোয়েন্দা! মানে ডিটেক-টিভ!"

''তা সেই গোয়েন্দাটা কে?'' গৌরাঙ্গ হাঁ হয়ে বলেন।

ফটিকও এবার টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আরও টানটান গলায় বলে, ''গোয়েন্দা হচ্ছে—খোকা-দাদাবাবু, আর আমি হচ্ছি ওনার—অ্যাসিসটেন্ট! ...আমরা দু'জনে—''

এবার গৌরাঙ্গ হো-হো করে হেসে উঠে বলে, ''খোকা দাদাবাবু হচ্ছেন গোয়েন্দা? রাতদিন গোয়েন্দা গল্প পড়ে পড়ে মাথাটা ঘোল হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ পালানোর খেয়ালটা জাগল কেন?''

রিংকু সতেজে বলে, "হঠাৎ মানে? বড় দাদুর 'যথাসব্বস্ব'টা হারানো বুঝি কিছু নয়? ভুতুড়ে কুকুরের ভৌতিক কান্নাটা বুঝি কিছু নয়? আর ওই ঘোলটা কলা খাওয়া 'বেনারসী গনৎকারে'র আমাদের ওপর মিথ্যে দোষ দেওয়াটাও কিছু নয়?"

কথা চলতেই থাকে।

বজ্রাঙ্গ ফিরে এসে বকার পরেও। কারণ. তিনি নিজেও তো তখন কথা শুরু করে দিয়েছেন।

ওই সন্ধের থেকে—দু'দিন পরের সকাল!

আগের দিন সকালে পাড়াসুদ্ধ সকলকে মিষ্টি খাওয়ানো হয়েছে। যারা আসেনি, মানে আসতে পারেনি, তাদের জন্য বাক্স ভর্তি-ভর্তি মিষ্টি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজও কিছু হচ্ছে। এখন তো আর সিংহবাহিনীর এসব ফরমাশ খাটবার লোকের অভাব নেই, ফটিক এসে গেছে।

পাড়ায় যতগুলো খাবারের দোকান ছিল, সব দোকান সাফ করে এনেও কুলোল না দেখে বাসে চেপে অন্য পাড়ার দোকান থেকে সন্দেশ রাজভোগ ক্ষীরমোহন পান্তুয়া নিয়ে এসেছে ফটিক ট্যাক্সিতে চাপিয়ে।

আবার আগামী কাল রবিবার এ-বাড়িতে সকলের নেমন্তন্ন। সিংহবাহিনীর ভাষায় 'ফিস্টি'। বিয়েবাড়ির মতো আয়োজন চলছে, ছাতে প্যাণ্ডেল বাঁধার বাঁশ তোলা হচ্ছে. এর মাঝখানে আজ 'রহস্যভেদ'-এর মীটিং বসেছে।

বড় হল - ঘরটায় বসেছেন বজ্রাঙ্গসুন্দর, সর্বাঙ্গসুন্দর, (হ্যাঁ, ওঁরা তো ট্রাঙ্ক কল পেয়ে পরদিনই চলে এসেছেন) গোরাঙ্গসুন্দর. সিংহ-বাহিনী, সর্বাঙ্গগৃহিণী, রিংকুর মা আর দুই মামা। আর রয়েছেন ইনস্পেক্টর ঘনশ্যাম দাস. এবং সেই দু'জন কনস্টেবল, যারা চিলেকোঠার ঘরে ফটিকের লাশ কেটে নামিয়েছিল। ...বটব্যাল-বাড়ির এঁরা ওদের আজ মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন, আগামী কাল ফিস্টি খাওয়াবেন। কাজেই পুলিসকে বৃথা 'হ্যারাস' করার জন্যে তাঁরা এখন আর ক্রুদ্ধ নন। আর বজ্রাঙ্গও ওদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এখন ওঁরা সবাই জমায়েত হয়েছেন রহস্য-ভেদের আশায়। হলের মাঝখানের বড় টেবিলের ধারে রিংকু আর ফটিক দাঁড়িয়ে, বাকিরা চেয়ারে সোফায়। টেবিলের ওপর দুটি কাগজ মোড়া বড় বড় প্যাকেট। এখনও খোলা হয়নি।

জবানবন্দী দিচ্ছেন গোয়েন্দা বঙ্কাদা আর তাঁর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মাকড়সা।

ঘনশ্যাম বললেন, "এরকম অদ্ভুত ছদ্ম-নাম তোমাদের মাথায় এল যে?"

রিংকু গম্ভীর গলায় বলে, "গোয়েন্দা আর তার সাকরেদের এইরকম সব অদ্ভুত নামই হয়।"

"ঠিক আছে। মাকড়সা, চিলেঘরের দরজা ভিতর থেকে খিল লাগানো থাকল, অথচ তুমি পালালে কোন্‌খান দিয়ে? মন্ত্রবলে. নাকি?"

ফটিক বিনীতভাবে বলে, "আজ্ঞে মন্তর-তন্তরের কী জানি? পালালাম বুদ্ধিবলেই। জানলায় লম্বা দড়ি গলিয়ে বাগান পর্যন্ত ঝুলিয়ে দড়ি ধরে নেমে পড়লাম।"

ঘনশ্যাম নাক কুঁচকে বললেন, "জানলায় তো শিক লাগানো, পাখি হয়ে গলে গেলে বুঝি?"

ফটিক মৃদু হেসে বলে, "শিক লাগানো ঠিকই। কিন্তু পরে দেখেছিলেন কি শিকগুলো সব ঠিকমতো লাগানো আছে কি না? আপনাদের তো দেখার কথা। নেড়ে, ঠুকে।"

ঘনশ্যাম রেগে বলেন, "তার মানে? তুমি কি বলতে চাও শিক খুলে তার ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে আবার শিক লাগিয়ে রেখে তবে তুমি সটকান দিয়েছ?"

ফটিক একটু মুচকে হাসে।

রিংকু শিখিয়ে দিয়েছে, গোয়েন্দাদের নিয়ম হচ্ছে পুলিসের লোকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলেই তাদের সঙ্গে ঠাট্টা করে কথা বলতে হয়, আর বাগে পেলেই তাদের ডাউন করতে হয়। তাই ফটিক মুচকে হেসে উত্তর দেয়, "বলতে চাই কেন? বলছিই তো। দুদিন ধরে শিকের গোড়াটা ছুরি দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে আর শিকটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আলগা করে রেখেছিলাম—সেদিন রাত্তিরে—"

হঠাৎ সর্বাঙ্গসুন্দর বলে ওঠেন, "দুদিন ধরে কী করে হতে পারে ফটিক? সেই দিনই তো তুমি রেগে উঠে—মানে কাশীর জ্যোতিষীর কথায় রেগে গিয়ে—"

"মোটেই না।"

গোয়েন্দা বঙ্কাদা তার শানানো ধারালো গলায় বলে ওঠে, "মোটেই না। বাড়ির কর্তার 'যথাসর্বস্ব' চুরি যাওয়ার দিন থেকেই আমরা এ সংকল্প করেছি।"

ফটিক লাজুক গলায় বলে, "আমরা আর কী? সব বুদ্ধিই তো তোমার।"

"আহা, তা কেন রে মাকড়সা?" বঙ্কাদা দরাজ গলায় বলে, "তেমনি সব খাটুনিই তো তোর?"

"হ্যাঁ, শুনুন আপনারা—আগে থেকে জানলার তিনটে শিক খুলে রাখা হয়েছিল। বাকি দুটো শিকের একটায় দড়ি গলিয়ে বাগানের দিকে ঝুলিয়ে দড়ি ধরে নেমে পড়ে, একটা গাছে চড়ে পাঁচিলে উঠে ওদিক থেকে ঠিক সেইভাবেই নেমে গিয়েছিলাম গাছের ডালে দড়ি লাগিয়ে। খুব সোজা প্ল্যান—"

ঘনশ্যাম দাস এ শুনে খিঁচিয়ে উঠে বলেন, "আমায় তো বেশ বোকা বোঝাচ্ছ খোকা? বলি ইনি তো নেমে গেলেন। শিকগুলো আবার লেগে গেল কী করে? নিজেরা নিজেরা যে যার গর্তে চেপে বসে গেল বুঝি?"

রিংকু আত্মস্থ গলায় বলে, "লক্ষ করে দেখেছিলেন কি ওই জানলাটার একটু নীচে দেয়ালের চওড়া কার্নিশ। ... সিঁড়ির ঘরে যেমন হয়। শিক তিনটেকে আগে আলাদা একটা দড়ি বেঁধে ওই কার্নিশে নামিয়ে দিয়ে তারপর মাকড়সা নিজে নেমে কার্নিশে দাঁড়িয়ে শিকগুলোকে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে বসিয়ে দিয়ে পরে নেমে গিয়েছিল। এসব তো আপনাদের মাথায় আগে আসা উচিত।"

ঘনশ্যাম এই একটা পুঁচকে ছেলের এরকম কটকটে কথায় মুখ ভোম্বল করে বলেন, "তা জানলায় বাঁধা দড়িটা কোথায় গেল? সেটাকে কি তোমার অ্যাসিসটেন্ট ভূতের মতো বাইশ হাত লম্বা হাত বার করে খুলে নিয়েছিল? সেটা থাকলে তো ঠিকই বোঝা যেত আসামী এই পথেই—"

এখন ফটিক বলে ওঠে, "তা আজ্ঞে আপনাদের বোঝার সুবিধের জন্যে ওটা ঝুলিয়ে রেখে এলেই ভাল হত মনে হচ্ছে। কিন্তু হয়েছে কী, আপনারা অগ্যেরাহ্যি করে আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছেন না। এ কথা বলিনি তো দড়িটা শিকে বেঁধেছিলাম। বলেছি শিকে গলিয়ে দিয়েছিলাম-—"

"সেটা কী হল?"

"সেটা? সেটা এই হল।" বলে ফটিক ফস করে পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে টেবিলে বসানো টেবল ল্যাম্পটার সরু

কোলকাতাটা একটা 'বেসিন'?

বর্ষা তো এসে গেল।

তোমাদের নিশ্চয়ই গত বর্ষার কথা ভেবে আতঙ্ক হচ্ছে। তাই না?

তাহলে কতগুলো খবর দিই, শোন! জানতো, কোলকাতাটা একটা গামলা বা 'বেসিনের' মত জায়গা? বৃষ্টি পড়লে চারদিক থেকে গর্তে যেমন জল জমে, কোলকাতা শহরেও তেমনি জমবেই।

তবে জল জমবেই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা তো চলে না— তাই একদিকে সি,এম,ডি,এ বহু জায়গায় নতুন জলনিকাশী ড্রেন তৈরী করেছে (এবং করছে ও করবে) এবং অন্যদিকে কর্পোরেশন ড্রেনগুলি যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করেছে।

ফলে, বৃষ্টির জল আগের মত বেশী দাঁড়ায়না, আর দাঁড়ালেও তাড়াতাড়ি সরে যায়।

একটু একটু করেই কোলকাতার জলনিকাশী ব্যবস্থা ভাল হবে।

কোলকাতা শহরটার উন্নতির জন্য সি,এম,ডি,এ কি করছে জানতে হলে জনসংযোগ বিভাগে (৩–এ অকল্যাণ্ড প্লেসে) চিঠি লেখো।

স্ট্যান্ডটাকে এদিক থেকে ওদিক ঘিরে রুমালের দুটো মুখে একটা গিঁট বেঁধে বলে, "এই ব্যাপার স্যর। দড়িটা বিরাট পেয়ে গিয়ে খুব সুবিধে হয়েছিল। শিকে একবার গলিয়ে নিয়ে দুটো মুখ এক করে গিঁট বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। সেই ডবল দড়ি ধরে নেবে পড়ে নীচেয় দাঁড়িয়ে গিঁট খুলে টান মেরে মেরে বাগিয়ে নিলাম।"

সবাই চুপচাপ বসে আছে।

যেন কোনো সিনেমা-থিয়েটার দেখছে।

অকস্মাৎ সিংহবাহিনী জোরালো গলায় প্রশ্ন করে ওঠেন, "ওই দড়িগাছাটা পেলি কোথায় রে ফটকে?"

ফটিক নির্ভয়ে বলে, "কোথায় আবার পাব, রাজার নেপ তোশকের সংগে ছিল তো!"

সিংহবাহিনী তীব্র গলায় বলেন, "হুঁ! তখনই বুঝেছি। আমার সেই ছাতে টাঙিয়ে লেপ-তোশক রোদে দেবার মোটকা মজবুত মস্ত দড়িটা নিয়েই তোদের লীলেখেলা হয়েছে। কোথায় ফেলেছিস সে দড়ি?"

"আঃ জ্যাঠাইমা! দড়ির কথা রাখো তো।" বললেন বজ্রাঙ্গসুন্দর।

কিন্তু সিংহবাহিনী কি দমবেন? বললেন, "কেন রাখব? দড়ি কি কম দরকারি জিনিস? তীর্থে যাবার সময় বিছানা বাঁধতে কিনেছিলাম।"

"আচ্ছা বাবা তোমায় দুশো গজ দড়ি কিনে দেব। এখন শুনতে দাও।......তা তারপর কী করলি?"

"তারপর? তারপর পূর্ব কথামতো বাস স্ট্যান্ডের ধারে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভোর হতে না হতে খোকাদাদাবাবু এসে জুটল।"

শুনে বাড়ির লোকের সকলের মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে, "তারপর?"

"তারপর? তারপর বাসে চেপে প্রথমে আন্নাপুর। সেখানে বাস বদলে মাকড়দা—"

"মাকড়দা? তোর বাড়ি না সেখানে?"

"তাই তো! একটা জায়গায় গিয়ে পড়তে না পারলে আপনারা হিঁচড়ে টেনে আনতেন না?"

বজ্রাঙ্গ চড়া গলায় বলেন, "তার মানে তুমিই দুর্মতিদাতা নাটের গুরু পালের গোদা শয়তান! ছোট বাচ্চাটাকে ভুলিয়ে—"

"কক্ষনো না। 'ছোট বাচ্চা' জোর প্রতিবাদ করে ওঠে, "সব পরামর্শ আমার। আমি তো জানি ওখানে ওর কে সব আপনার লোক আছে। যদিও মাও নেই, বাবাও নেই। থাকতে শুধু মাসি আর মাসির ছেলে। মুকুন্দ, যাত্রা-পার্টির মুকুন্দ। মুকুন্দ, ইয়ে মুকুন্দদা আমাদের জুতো জামাটামা সব তুলে রেখে ছদ্মবেশে সাজিয়ে দিল। সন্নিসির ছদ্মবেশ। বলল, এই বেশে যেখানে ইচ্ছে ঘোরো, কেউ সন্দেহ করবে না—চিনতেও পারবে না।"

"হুঁ। বুঝেছি। তারপর?"

সকলের শ্বাস রুদ্ধ।

"তারপর—অনেক ঘুরে ঘুরে বড়দাদুর সেই 'যথাসর্বস্বর' চোরের বাসাটা খুঁজে বার করলাম।"

"সর্বনাশ! কে তোদের সন্ধান দিল সে বাসার?"

"কে আবার?"

গোয়েন্দা বঙ্কাদা এদের অজ্ঞতায় হেসে ওঠে, "গোয়েন্দাদের আবার কে সন্ধান দিয়ে যায়? নিজেরাই পায়। কিছুটা সন্ধান তো আগেই নিয়ে রেখেছিল ফটি—ইয়ে মাকড়সা ভুতুড়ে কুকুরের পায়ের ছাপ ধরে ধরে। খুঁজে খুঁজে সেখানে পৌঁছে গেলাম।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

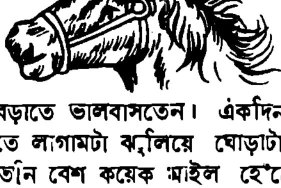

নিউটন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে ভালবাসতেন। একদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে কিছুদূর গিয়ে তিনি নেমে পড়লেন, আর হাতে লাগামটা ঝুলিয়ে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললেন। গভীর-ভাবে কিছু ভাবতে-ভাবতে তিনি বেশ কয়েক মাইল হেঁটে ফেললেন, তার পর হঠাৎ তাকিয়ে দেখেন পাশে ঘোড়াটা নেই। মাথা থেকে বল্গাটা গলিয়ে ফেলে দিয়ে সে কখন সরে পড়েছে, আর নিউটনের হাতের ওপর ঝুলছে ঘোড়ার বল্গা-লাগাম।

উদ্ভুটি

মৃণালকান্তি দাশ

রাজপুরীতে সোনার আগল
তাতে রুপোর খিল ছিল—
সামনে অথৈ বুকভাঙা ঢেউ
অশান্ত এক ঝিল ছিল।
অনেক উঁচু মাথার উপর
আকাশ ভরা নীল ছিল,
দিন দুপুরে চরকি দেওয়া
মস্ত ডানার চিল ছিল।
সেই পুরীতে থাকত রাজা,
বিরাট বড় দিল ছিল—
হরিশচন্দ্র রাজার সাথে
তেনার ভারী মিল ছিল।
মুখের উপর চাঁদের মতো
চকচকে তাঁর তিল ছিল,
উদ্ভুটি এই গল্পখানা
মিতুন বসে গিলছিল!

ছবি দেবাশিস দেব

মণিমেলার খবর

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাংলা ইংরেজি ও হিন্দি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ১৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি বিষয়ে চারটি করে বিভাগ। বিস্তারিত খবরের জন্য মণিমেলা মহাকেন্দ্র, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক-২, রুম-৫, কলকাতা ৭০০০২৯ (ফোনঃ ৪৬-৯৮১০)—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে। নাম দেবার শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি মণিমেলা পতাকা দিবস হিসেবে পালিত হয়েছে। ওইদিন মণিমেলার ভাইবোন ও স্বেচ্ছাসেবীরা শিশুকল্যাণ তহবিলের জন্য ১৪,৬২৩ টাকা সংগ্রহ করে। কেন্দ্রপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার দাতাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মণিমেলা মহাকেন্দ্রের নিয়মিত শাখা-কেন্দ্রগুলি মে মাসে বুদ্ধদেব, রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও গুরুসদয় দত্তের জন্মদিবস পালন করে। এই উপলক্ষে প্রভাতফেরি, আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, আলোচনা চক্র, প্রদর্শনী, ব্রতচারী নৃত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মণিসন্দেশ

মণিমেলার এই শাখাকেন্দ্রগুলি সম্প্রতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উৎসব, ক্রীড়া-সঙ্গীত-নৃত্য প্রতিযোগিতা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদির আয়োজন করেছিল ঃ

মধ্যমগ্রামের পল্লীশ্রী বিধান মণিমেলা, কলকাতার কসবা মণিমেলা, বেহালার বৈশাখী মণিমেলা, হাবড়ার অশোক মণিমেলা, মধ্যমগ্রামের মহাভারতী মণিমেলা, নবদ্বীপের বিদ্যার্থী মণিমেলা, কাঁচড়াপাড়ার বিবেকানন্দ মণিমেলা, মেদিনীপুরের চরৈবেতি মণিমেলা, হাওড়ার পল্লীমঙ্গল মণিমেলা, মধ্যমগ্রামের পল্লীশ্রী বিধান মণিমেলা, যাদবপুরের মহাজাতি মণিমেলা, গার্ডেনরীচের আদর্শ মণিমেলা, গরিফার প্রগতি মণিমেলা এবং নবদ্বীপের বিদ্যার্থী মণিমেলা।

বিশেষ খবর

কাঁচড়াপাড়ার বিবেকানন্দ মণিমেলা সম্প্রতি একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যে রক্তদান করে।

বুদ্ধিমতী মেয়ে

(কাশ্মীরী উপকথা)

আরতি দাস

এক সদাগরের একটি মাত্র ছেলে। ছেলেটি বিষম বোকা। খায়-দায় আর ঘুরে বেড়ায়। ব্যবসার বেচাকেনার কাজে মন নেই। বোঝেও না কিছু। ওর মা বলেন, "বিয়ে দাও ছেলের। তা হলেই চালাক চতুর হয়ে উঠবে।"

সদাগর সে কথায় কান দেন না।

একদিন ভোরবেলা সদাগর ছেলেকে ডেকে তিনটি পয়সা দিয়ে বললেন, "এক পয়সার পয়সা জলে ফেলবে? আবার বাবার কথা না শোনাও তো খুব দোষের। চুপচাপ নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে সে ভাবছে তো ভাবছেই।

সেই নদীর ঘাটের ওপরেই এক জেলের বাড়ি। জেলের মেয়ে সকালে জল নিতে এসে, আবার দুপুরে স্নানের সময়েও সদাগরের ছেলেকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শুধোল, "কী ব্যাপার?"

পয়সা জলে ফেলার কথা শুনে মেয়েটি হেসে উঠল। বলল, "পাগল নাকি? কত কষ্ট করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একটা পয়সা রোজগার হয়। ওটা পকেটে রাখো। আর বাকি পয়সায় একটা তরমুজ কিনে বাড়ি যাও।"

খাবার খেও। দ্বিতীয় পয়সাটা জলে ফেলে দিও। বাকি পয়সা দিয়ে এমন জিনিস কিনবে, যা খেলে তেষ্টা মেটে, আবার গরু-ছাগলেরও খাবার হয়।"

ছেলেটি তো খুব খুশি। এক পয়সার খাবার কিনে নিয়ে দ্বিতীয় পয়সাটা জলে ফেলতে এসেই মহা মুশকিলে পড়ে গেল। পুরো এক

তখন ছেলেটির টনক নড়ল। তাই তো, তরমুজ খেলে তেষ্টা মেটে, আবার খোসাগুলি দিব্যি গরু-ছাগলে খেতে পারে।

ছেলেকে তরমুজ কিনে বাড়ি ফিরতে দেখে সদাগর তো তাজ্জব। সদাগরের বউ বললেন, "দেখলে তো! কী তুখোড় বুদ্ধি আমার ছেলের।"

সদাগরের মনের ধোঁকা গেল না। ছেলেকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করতেই আসল ব্যাপারটা জেনে ফেললেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "তাই বলো, এত বুদ্ধি কী তোমার হবে?"

পরদিনই জেলের মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ের কথা বলতে লোক পাঠালেন জেলের কাছে। জেলে তো এক কথায় রাজি, অত বড়লোকের ছেলে হবে তার জামাই! বিয়ের দিন-সময় ঠিক হয়ে গেল একেবারে।

এদিকে সদাগরের ছেলের ইয়ার-বন্ধুরা এসে ওকে পরামর্শ দিতে লাগল, আরে, তোমার চেয়ে তোমার বউ বেশি চালাক হলে কি তোমার মান থাকবে? তুমি বিয়ের রাত্তিরেই বউকে আচ্ছাসে পয়জার মারবে। তাহলেই বউ দুরস্ত হয়ে যাবে একেবারে। পয়জার মানে পায়ের চটি। নতুন বউকে জুতো মারতে হবে শুনে সদাগরের ছেলে ভারী মুষড়ে পড়ল। কিন্তু বন্ধুদের কথা তো আর ফেলা যায় না।

একদিন দারুণ ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের রাতে খুব চমৎকার পোশাক পরে হাসিখুশি হয়ে বসে আছে জেলের মেয়ে। সদাগরের ছেলে এল। ঘরে ঢুকে পা থেকে চটি খুলে যেই না বউকে মারতে যাবে, অমনি বরের হাতটা খপ করে ধরে ফেলল কনেবউ। তারপর বলল, "কী ব্যাপার? খামোখা এমন চটলে কেন?"

স্বামীর বন্ধুরা ওকে পয়জার মারতে বলেছে শুনে মেয়েটি তো হেসেই অস্থির। বলল, "ঠিক আছে তুমি একটু বোসো। আমি আসছি।" এই না বলে বাড়ির পেছন-দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সটান নদীর ধারে, ওর বাবার কাছে গিয়ে উপস্থিত।

পরদিন ব্যাপারটা জানাজানি হতে সদাগর ছেলেকে ডেকে বললেন, "বাপু হে, তোমার বিয়ে হয়েছে। সংসারের খরচ বাড়ল। এবার রোজগারে বেরোও।" এই বলে, অনেক দামি দামি কার্পেট, খোদাই-করা কাঠের সুন্দর সব জিনিস, মালপত্র আর টাকাকড়ি দিয়ে ওকে ব্যবসা করতে পাঠিয়ে দিলেন বিদেশে।

দশ-বারোটা খচ্চরের পিঠে সে-সব জিনিস চাপিয়ে নানা জায়গা ঘুরে এক দেশে এসে পৌঁছল সদাগরের ছেলে। সেই দেশের বড় রাস্তার ওপরে মস্ত একটা ঢোল আর হাতুড়ি। পাশে লেখা : যে-কেউ এ দেশের রাজকন্যার সঙ্গে পাশা খেলতে চাও তো এই ঢোলে ঘা দাও। খেলায় জিতলে, রাজত্ব আর রাজকন্যা পাবে। হেরে গেলে সারা জীবন চাকর হয়ে থাকতে হবে রাজকন্যার।

সদাগরের ছেলে ভাবল, বাঃ, এই তো সুযোগ রাজা হবার। একবার রাজা হতে পারলে এভাবে আর মালপত্র বইতে হবে না। সাত-পাঁচ না ভেবেই সে হাতুড়ি তুলে ঢোল বাজাল। চোখের পলকে রাজকন্যার সেপাইরা এসে ঘিরে ফেলল ওকে। তারপর ধরে নিয়ে গেল রাজকন্যার কাছে।

তিনদিন ধরে চলল পাশাখেলা। হেরে ভূত হয়ে গেল সদাগরপুত্র। তখন ওর খচ্চর আর জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে ছেঁড়া কামিজ আর তালি-দেওয়া পায়জামা পরিয়ে চাকরের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল ওকে।

এদিকে বছর ঘুরে এল অথচ ছেলের কোনো খবর না পেয়ে খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছেন সদাগর। একদিন জেলের মেয়ে এ-বাড়ি এসে শ্বশুরমশাইকে বলল, "আপনার ছেলের মতো আমাকেও ব্যবসার মালপত্র দিন। আমি ওর খোঁজখবর নিয়ে আসি।"

তাই দিলেন সদাগর। মালবোঝাই খচ্চরদের তাড়িয়ে এক গভীর জঙ্গলে এসে ঢুকল জেলের মেয়ে। তারপর মেয়ের বেশ পালটে, পুরুষের পোশাক পরে যখন বেরোল তখন কেউ আর ওকে মেয়ে বলে চিনতে পারল না। সবাই ভাবল এক বণিক যাচ্ছে বিদেশে।

বণিকের বেশে ঘুরতে ঘুরতে পথের লোককে জিজ্ঞেস করে করে শেষে একদিন সে সেই পাশাবতী রাজকন্যার দেশে এসে পৌঁছল। এক সরাইখানার যাত্রীদের মুখে নানারকম গল্প শুনে ওর দৃঢ় ধারণা হল, সদাগরের ছেলে এখানেই আছে। তখন ঢোলে ঘা দিয়ে পাশা খেলতে বসল রাজকন্যার সঙ্গে।

প্রথম দিন তো খেলায় হেরে গেল বণিক। কিন্তু লক্ষ করে দেখল, একটা ইঁদুর রাজকন্যার আশেপাশেই কোথাও যেন লুকিয়ে থাকে। পাশার দান ফেললেই ঝাঁপিয়ে পড়ে গুটি উলটে দিয়ে পালিয়ে যায়। পরদিন সে একটা হুলো বেড়াল সঙ্গে করে আনল। হুলোর ভয়ে ইঁদুর আর এল না। সেদিন রাজকন্যা হেরে গেল। তার পরদিনও তাই।

তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাজকন্যা হাত-

জোড় করে বলল, "হে বণিক, আপনি এখন এ রাজ্যের রাজা। যা বলবেন, তাই হবে।"

বণিকবেশী জেলের মেয়ে তখনই হুকুম করল, "যারা এতদিন তোমার চাকর হয়ে আছে, তাদের সবাইকে হাজির করো।"

সবাই এলে সদাগরের ছেলে ছাড়া আর সকলকে ছেড়ে দিয়ে সে বলল, "তোমরা বাড়ি চলে যাও। তারপর পঞ্চাশটা খচ্চরের পিঠে সোনা-রুপো, হীরে-জহরতের বস্তা বোঝাই করে রাজকন্যা, সদাগরের ছেলে আর অনেক সেপাই সঙ্গে নিয়ে রওনা হল দেশের দিকে। বেচারি সদাগরের ছেলে খচ্চরদের পেছনে হাঁটছে আর ভাবছে, সবাই ছাড়া পেয়ে কেমন দিব্যি বাড়ি চলে গেল, আর আমি এখনও চাকর হয়ে আছি।

নিজেদের গাঁয়ে ফিরে সেই জঙ্গলের কাছাকাছি আসতেই বণিক সদাগরের ছেলেকে ডেকে বলল, "তুমি এইসব ধনরত্ন, রাজকন্যা আর সেপাইদের নিয়ে তোমার বাড়ি গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি আসছি ওখানে।"

তখন সদাগরের ছেলেকে আর কে পায়। সেই সব মালপত্র আর রাজকন্যাকে নিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকেই মহা হুলুস্থুল বাধিয়ে দিল। গোলমাল শুনে পাড়ার লোক ছুটে এল। সদাগরের ছেলে সবাইকে শুনিয়ে বলতে লাগল, "এই দ্যাখো, এত সব জিনিস আর রাজকন্যা আমি রাজ্য জয় করে এনেছি। আমার হিম্মত কেমন, তা বোঝো।"

এমন সময় বণিকের পোশাক পালটে জেলের মেয়ে এসে শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করে হেঁট মুখে দাঁড়াতেই, সদাগরের ছেলে মহা খাপ্পা হয়ে তেড়ে এল বউকে মারতে। পাড়ার লোক কোনমতে ঠেকিয়ে রাখল ওকে।

তখন নিরুপায় জেলের মেয়ে শ্বশুরমশাইকে সব কথা খুলে বলতে রাজকন্যাও জেলের মেয়ের কথা সত্যি বলে স্বীকার করল। সব শুনে সদাগর ছেলেকে ডেকে বললেন, "ব্যস্, আর কোনো কথা নয়। এই রাজকন্যাকে বিয়ে করে, দুই বউ নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করো তুমি। কিন্তু খবরদার, জেলের মেয়ের গায়ে ফের যদি হাত তোলো, তো জন্মের মতো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব তোমায়।"

ধমক খেয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো বাবার কথায় ঘাড় নাড়ল সদাগর-পুত্র।

ছবি - মদন সরকার

ছবির মজা

কাঠের ঘোড়া

ফুটকিগুলোকে লাইন দিয়ে টেনে জুড়ে দাও। বাস্, কাঠের ঘোড়ার ছবিটা এবারে স্পষ্ট হল। এইবারে এক কাজ করো। রঙিন পেনসিল দিয়ে এই ছবির বিভিন্ন অংশ তোমরা রঙ করে নাও।

লুকোনো দোলনা

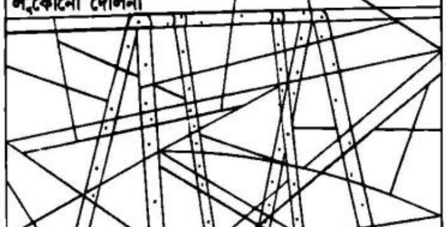

দোলনায় বসে আনন্দমেলা পড়তে চাও? বেশ তো, ফুটকি-দেওয়া অংশগুলিকে রঙিন পেনসিল দিয়ে ভরাট করে ফেলো তো! করেছ? বা রে, কী সুন্দর দোলনা!

বাঘা

যাঃ, পালিয়ে গেল! এখন বিল্টুর কী করে?
থালা বাজালেই ভাববে খেতে দিয়েছি, অমনি ফিরে আসবে।
বেশ তো, বাজা!
তুই বাজা, আমি দেখি!
কী রে, ফিরল?
বাপ্‌স!

কিছু বই দিবি?
নিশ্চয়! ইতিহাস আর বিজ্ঞানের এই বই দুখানা নিয়ে যা!
খান কয় বই চাই? বেশ তো, দিচ্ছি।
বই? নিশ্চয় দেব। যাক, পড়াশোনায় তোর মন হয়েছে তাহলে।
ওরেব্বাবা, এত বই পড়বি নাকি?
না রে, পড়ব না...
এই বুক কেসটাতে সাজিয়ে রাখব!

দেখার সঙ্গে ছোঁয়া

কুন্তক

টুম্পি আজকাল কাজ করতে শিখেছে অনেক। সবার জন্যে বেশ পরিপাটি করে বিছানা করছে এখন।

চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে নন্তু বলছে ঃ সাবধান, একটুও যদি ভাঁজ পড়ে চাদরে, তাহলে কিন্তু আমি শোব না।

বাপ্ রে, নবাবপুত্তুর এলেন!

নবাবপুত্রই তো। ধবধবে বিছানা না হলে আমার ঘুম হয় না, জানিস? না, ধবধবে তো নয়। ঠিক-ঠিক বলতে হবে। কী বলব কাকু? দুগ্ধফেননিভ শয্যা?

ঠাট্টা হচ্ছে?

ঠাট্টা কেন হবে? তুমিই তো বললে ঠিকমতো বোঝাতে গেলে মতো-কথাই বলতে হবে।

বল্ তবে।

টুম্পি বলে ঃ আচ্ছা কাকু, এর মধ্যে আবার দুধকে টেনে আনা কেন? ...ধরো, দেয়ালটাও তো সাদা। তো বললেই হয় দেয়ালের মতো বিছানা।

একটু ভেবে দেখ্ তো কেন তবু বলে না ওটা?

না ভেবেই বলল টুম্পি ঃ না, না, কত দেয়াল তো রঙিনও হয়। ঠিক!

ঠিক, কিন্তু আরো ব্যাপার আছে। ধর্ চুন তো আর রঙিন নয়। তাহলে যদি বলি চুনের মতো বিছানা?

বলো না। দোষ কী?

দোষ কিছু নেই, তবে দুধের ফেনার মতো বললে আরো বেশি এই বিছানার কাছে আসতে পারিস। কেননা একটা মজা দেখ্, এর মধ্যে যে কেবল রঙটারই কথা আছে তা নয়। এর মধ্যে আরো আছে এর হালকাপনার কথা, এর নরম ছোঁয়ার কথা। তার মানে, ওই কথাটা বললে তুই যে কেবল দৃশ্যটাকেই মেলাচ্ছিস তা নয়, স্পর্শটাকেও মেলাচ্ছিস।

তাই বুঝি? বেশ তো মজা। খুব বুদ্ধি করে বানিয়েছে তো!

প্রথম যে বানিয়েছিল কথাটা তার নিশ্চয় বুদ্ধি ছিল খুব। আমরা কেবল আউড়ে যাই মুখস্থের মতো।

নতুন আর বানানো যায় না এরকম?

যাবে না কেন? বানায় তো অনেকে। চেষ্টা করলে তোরাও নিশ্চয় পারবি বানাতে।

নন্তু বলল ঃ বেশ, তবে বানানো যাক। রাস্তার ওই বিছানাটাকে কী বলবি টুম্পি?

রাস্তার? ফুটপাথে শুয়ে আছে যারা, তাদের আবার বিছানা কোথায়?

ওই হল। শুধু ফুটপাথে নয়, গরমের ঠেলায় দেখ্-না ওই ঠেলাওয়ালারা কেমন খোলা পিচের রাস্তাতেই শুয়ে পড়েছে!

গাড়ি আসে যদি?

এত রাতে তো এ রাস্তায় বড়ো-একটা আসে না গাড়ি। কিন্তু আগে বল্, কী রকম ওই বিছানা?

কী রকম? আকাশের মতো?

দূর! আকাশটা কি অত কালো?

আর তাছাড়া, আকাশ তো শক্তও নয়। ওই বিছানাটা নিশ্চয় বেশ খটখটে।

আকাশকেও অবশ্য খটখটে বলে কেউ কেউ।

পেয়েছি দাদা, পেয়েছি। ওই বিছানাটা হল স্লেটের মতো। বলা যায় না কাকু?

আমাকে একেবারে পাত্তা না দিয়ে নন্তু জবাব দিল ঃ নিশ্চয় বলা যায়। স্লেটের পাশে যে হলদেটে কাঠ থাকে, দুপাশের ফুটপাথ হল তাই। না রে?

তুলনার এই বিস্তারে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ি।

ক্রিকেট চলছে

প্রসাদ

খাবার পর বাবা আর ছেলেতে ক্রিকেট নিয়ে আরও খানিকক্ষণ প্রশ্নোত্তর চলল। কিন্তু তোমরা তো জানোই ক্রিকেট খেলার নিয়ম-কানুন, কাজেই সে-সব কথার সবটাই আমাদের শুনবার দরকার নেই। তার চেয়ে বরং এসো, আমরা যতটা শুনলাম, তাই একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখি আর নিজেরা ওই রকম ধরনের কথা বানাতে চেষ্টা করি।

নীচে জোড়ায়-জোড়ায় প্রশ্ন দিচ্ছি, তার একটার উত্তর থাকছে, আরেকটার উত্তর তোমরা দাও, প্রথমটার ধরনে।

1. Q. What's cricket?
 Ans. It's a game.
 Q. What's an orange?
 Ans.................
2. Q. What does the batsman try to hit?
 Ans. He tries to hit the ball.
 Q. What does the bowler try to hit?
 Ans.................
3. Q. What happens if the batsman sends the ball across the boundary?
 Ans. If the batsman sends the ball across the boundary, he gets four runs.
 Q. What happens if the ball hits the wicket?
 Ans.................
4. Q. How many fielders are there on the field?
 A. There are eleven fielders on the field.
 Q. How many batsmen are there on the field?
 Ans.................
5. Q. What does a batsman wear on his hands?
 Ans. A batsman wears gloves on his hands.

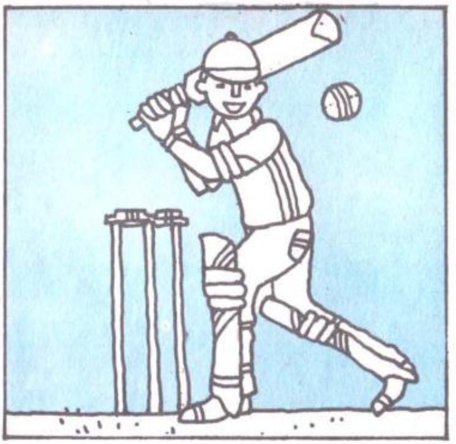

 Q. What does he wear on his legs?
 Ans.................
6. Q. Where does the wicket-keeper stand?
 Ans. The wicket-keeper stands behind the wicket.
 Q. Where does the batsman stand?
 Ans.................
7. Q. What is the colour of a cricket ball?
 Ans. The colour of a cricket ball is red.
 Q. What is its shape?
 Ans.................
8. Q. Which side loses?
 Ans. The side that makes fewer runs loses.
 Q. Which side wins?
 Ans.................
9. Q. How many balls are bowled in an over?
 Ans. Six balls are bowled in an over.
 Q. How many innings are played in a match?
 Ans.................

এই বারে তোমরা আনন্দমেলার এই সংখ্যা আর আগের সংখ্যার প্রশ্নোত্তর থেকে ক্রিকেট সম্বন্ধে একটা ছোট রচনা লিখে ফেল, কেমন?

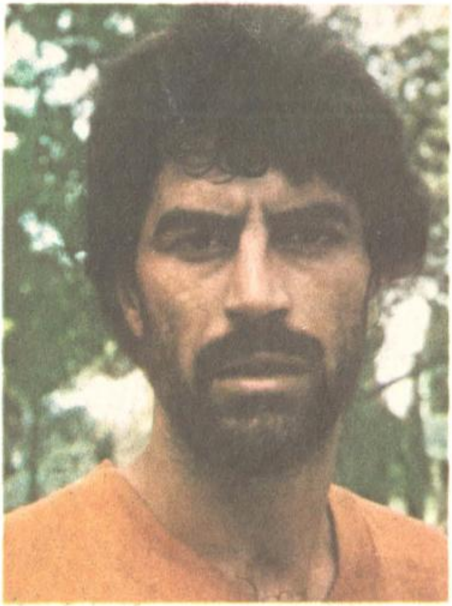

খাবাজি

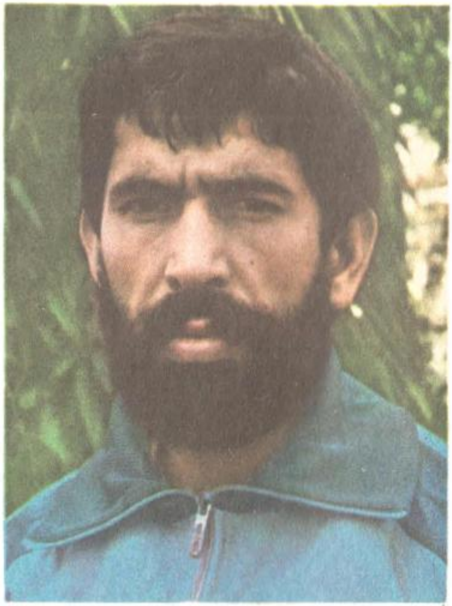

সানজারি

খাবাজি-সানজারি

অলোক দাশগুপ্ত

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জোড়া ইরানি মামুদ খাবাজি এবং আহমদ সানজারি, ইতি-মধ্যেই কলকাতা মাঠে কিছুটা সুনাম কুড়িয়েছেন। ভারতে আসার আগে দুজনেই ইরানের প্রথম ডিভিশনে নিয়মিত ফুটবল খেলতেন। খাবাজি খেলতেন বার্গে এবং সানজারি ডোরে ক্লাবে। ১৯৭৪ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় খাবাজি ইরানের প্রতিনিধিত্ব করেন। ক্ষমতাচ্যুত শাহের পুত্রের নামাঙ্কিত যুব ফুটবলের এই আসরটি ইরানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা এবং এতে আর্সেনল, ব্রাজিল, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি শক্তিশালী দল অংশ নিয়ে থাকে। এই বছর থেকে টুর্নামেণ্টটি সম্ভবত বন্ধ হয়ে যাবে।

ইরানে প্রত্যেক যুবককে অন্তত দুই বছরের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হয়। সানজারি ১৯৭৬ সালে এশীয় সেনাবাহিনী ফুটবল প্রতিযোগিতায় স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

বাইশ বছরের খাবাজি তিন বছর আগে স্ট্যাটিসটিকসে স্নাতক হওয়ার জন্য আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বর্তমানে তিনি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। বি এস-সি পাস করার পরে খাবাজি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটে যোগ দিতে চান।

মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কর্মকর্তা মাসুদ আলিগড় ফুটবল ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট সুলতান আখতারের মাধ্যমে খাবাজিকে কলকাতা মাঠে খেলার আমন্ত্রণ জানান। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েই খাবাজি গত বছর মহমেডানে যোগ দেন।

সানজারি বয়সে খাবাজির চেয়ে প্রায় দুই বছরের বড় হলেও পড়াশুনার ব্যাপারে একটু পিছিয়ে আছেন। আলিগড় মুসলিম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে সবে ভারতে এসেছেন। সস্ত্রীক। ইংরেজিতে তাঁর ভাল দখল না থাকায় খাবাজিকে প্রায়ই তাঁর দোভাষী হিসেবে কাজ করতে হয়। খাবাজিই এই বছর সানজারিকে মহমেডান স্পোর্টিংয়ে নিয়ে এসেছেন।

সানজারি মূলত স্টপার-ব্যাক খাবাজি লিংকম্যান। কিন্তু কলকাতা মাঠে ওঁদের বিভিন্ন পজিশনে খেলতে দেখা গেছে। জানতে চেয়ে-

ছিলাম ওঁদের এতে কোনো অসুবিধে হয় কি না?

খাবাজি বললেন, ''আধুনিক ফুটবল খেলায় একজন খেলোয়াড়কে প্রত্যেক পজিশনে খেলতে হতে পারে।''

তবে, ইরানে খাবাজি বা সানজারি কখনও বিভিন্ন জায়গায় খেলেননি।

''আমাদের প্রথম ডিভিশন দলগুলিতে প্রত্যেকটি পজিশনের জন্য তিন-চারজন করে খেলোয়াড় থাকে, অতএব অন্য জায়গায় খেলার সুযোগ কোথায়?''

খাবাজি-সানজারি এখানে এসে দেখেছেন, দিনের পর দিন প্রচণ্ড রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ফুটবল-রসিকরা প্রিয় দলের খেলা দেখতে আসেন। ওঁরা কিন্তু এতে বিস্মিত হননি। ইরানের বৃহত্তম স্টেডিয়াম আরিয়ামার (এক লাখ লোক খেলা দেখতে পারে) বা আমজাদিতে (৫০,০০০ দর্শকের উপযোগী স্টেডিয়াম) যেদিন ফুটবল ম্যাচ থাকে, ভোর থেকে দলে দলে দর্শক এসে পছন্দসই জায়গা বেছে নেন। ওঁরা অবশ্য মন দিয়ে খেলা দেখেন, কলকাতার দর্শকদের মতো কথায় কথায় মাঠে ঢিল ছোঁড়েন না।

তবে কোনো কারণেই খাবাজি-সানজারি কলকাতার ফুটবল দর্শকদের দোষ দিতে চান না। খাবাজি বললেন, ''আমরা দর্শকদের মনের অবস্থা বুঝি। অসহ্য গরমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ওঁরা আমাদের খেলা দেখতে আসেন। আমরা ভাল না খেলতে পারলে ওঁদের ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা তো ইচ্ছে করে খারাপ খেলি না। সমর্থকদের কাছে আমার অনুরোধ, এই কথাটা যেন তাঁরা মনে রাখেন।''

খাবাজির চোখে কলকাতার ফুটবলের মান ভারতের অন্য রাজ্যগুলির চেয়ে অনেক উন্নত। তবে কখনোই ইরানের মতো নয়। একটা ব্যাপার খাবাজি-সানজারিকে অবাক করে। কলকাতা ফুটবলে চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই প্রতি বছর মাত্র তিনটি ক্লাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ইরানে এটা ভাবাই যায় না। ওখানে প্রথম ডিভিশনে খেলে ১৬টি দল। প্রতিটি দলের মধ্যে এত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে, প্রথম দলের সঙ্গে লীগ টেবিলের নীচের দলটির পয়েন্টের তফাত হয় বড় জোর পাঁচ-ছয়।

ওঁদের মতে এশীয় ফুটবলে ইরান শক্তি-

সানজারি ও তাঁর স্ত্রী ফোটো জয়ন্ত দে

শালী দল হয়ে উঠতে পেরেছে প্রধানত ইউরোপীয় কোচদের দৌলতে। ইরানের ১৬টি প্রথম ডিভিশন দলের আট-ন'জন কোচই ইউরোপীয়ান। বিখ্যাত জার্মান কোচ ক্র্যামার ইরানের জাতীয় কোচ। ক্র্যামারের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়ে ইরানিরাও প্রথম ডিভিশন দলগুলিকে কোচ করছেন। আধুনিক ফুটবলের কলাকৌশল ইউরোপ থেকে খুব দ্রুত ইরানে এসে পৌঁছয় ইউরোপীয় কোচদের মাধ্যমে।

এখানকার কোচিং পদ্ধতি খাবাজি-সানজারিকে বিস্মিত করেছে। খাবাজি বললেন, ''মোহনবাগানের পি কে ব্যানার্জি বা ইস্ট-বেঙ্গলের অরুণ ঘোষের কোচিং সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই, তবে আমি শুনেছি, ওঁরা দুজনই খুব ভাল কোচ। আমার নিজের ক্লাব মহমেডান স্পোর্টিংয়ের অনুশীলনের মধ্যে আমি কিন্তু কখনো বৈচিত্র্য খুঁজে পাইনি। দিনের পর দিন একই ধরনের ট্রেনিং—বোরিং ব্যাপার।''

ইরানে প্রতিদিন সকালে দুঘণ্টা এবং বিকেলে দুঘণ্টা কোচিংয়ের জন্য বরাদ্দ। কিন্তু কোচরা নতুন নতুন পদ্ধতিতে ট্রেনিং দেন বলে খেলোয়াড়দের কখনো একঘেয়েমিতে পেয়ে বসে না। থিওরিটিক্যাল ক্লাস নেওয়া হয়। ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকার নামী ফুটবল দলগুলির খেলার স্লাইড এবং ফিলম ইরানি ফুটবলাররা দেখে থাকেন। তাছাড়া সুযোগ পেলেই তাঁরা ঐ সব দেশে ফুটবল খেলতে যান।

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

কোথায় সেই লড়াই

শ্যামসুন্দর ঘোষ

ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার আগে ভারতীয় অধিনায়ক বেঙ্কটরাঘবন অনেক আশার বাণী শুনিয়েছিলেন। বেঙ্কটের কথায় অনেকের মনে হয়েছিল যে, ভারত প্রুডেনশিয়াল কাপের সেমি ফাইনালে তো উঠছেই, ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে ফাইনালেও উঠতে পারবে। কিন্তু এটা যে নেহাত কথার কথা, ক্রিকেট-অনুরাগী মাত্রই তা এখন জানেন। একদিনের ক্রিকেট খেলতে হলে যে ধরনের মানসিকতার প্রয়োজন, তা অধিকাংশ ভারতীয় খেলোয়াড়ের নেই। নেতি-মূলক ক্রিকেট খেলতে ভারত বরাবরই অভ্যস্ত। বলকে মারের উপযোগী করে নেওয়ার চাইতে ব্যাটসম্যানরা অপেক্ষা করে থাকেন, কখন

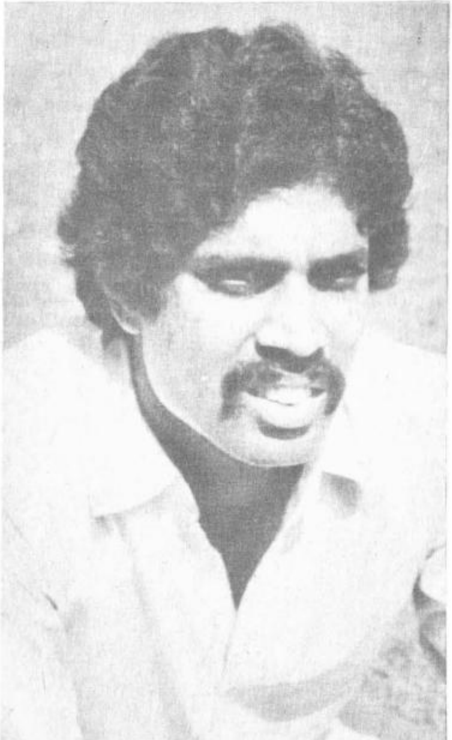

কপিলদেব

বোলারের হাত থেকে 'লুজ বল' বেরোবে। বেঙ্কট বলেছিলেন, "আমরা লড়ব।" কিন্তু কোথায় সেই লড়াই? তার কণামাত্রও দেখা গেল না। পর পর তিনটি খেলাতেই আমরা হেরেছি।

প্রুডেনশিয়াল কাপ বা ষাট ওভারের ক্রিকেটের এটি দ্বিতীয় আসর। চার বছর আগে এই ইংল্যাণ্ডেই হয়েছিল প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ১৯৭৫ সালে প্রথম খেলায় ইংল্যাণ্ডের চার উইকেটে ৩৩৪ রানের প্রত্যুত্তরে ভারত ষাট ওভারে তিন উইকেটের বিনিময়ে সংগ্রহ করেছিল মাত্র ১৩২ রান। সুনীল গাভাসকারের অপরাজিত ৩৬ রান মন্থর ক্রিকেটের এক অনন্য নজির। পূর্ব আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলায় ভারত অবশ্য জিতেছিল দশ উইকেটে। কিন্তু যে খেলার সাফল্যের ওপর ভারতের সেমি-ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেই খেলায় ভারত পরাজিত হয় চার উইকেটে। খেলাটি ছিল নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারতের রান সংখ্যা একসময়ে দাঁড়িয়েছিল ৩২ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ১০৮। শেষ ৪ উইকেটে ভারত সংগ্রহ করেছিল ১২২ রান। এর মধ্যে আবিদ আলির ৭০ রান উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৫ সালের মতো এ বছরও ক্রীড়াসূচী ছিল ভারতের অনুকূলে। কারণ, শক্তিশালী তিনটি দল—ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানকে একটি গ্রুপে রাখা হয়। এই তিনটি দল নিঃসন্দেহে ভারত ও নিউজি-ল্যাণ্ডের চাইতে শক্তিশালী। এই ক্রীড়াসূচী দেখে বোধহয় বেঙ্কট কিছুটা আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। কারণ, নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের জয়ের সংখ্যা কম নয়।

টেস্ট ক্রিকেট ও একদিনের খেলার মধ্যে পার্থক্য অনেক। সীমিত ওভারের খেলায় ব্যাটসম্যানদের নজর থাকে দ্রুতগতিতে রান তোলার দিকে। ১৯৭৫ সালে ভারতের ওভার পিছু রানের গড় ছিল ৩.২১। গড়পড়তার হিসেবে ভারতের স্থান ছিল পূর্ব আফ্রিকার ওপরে। এমন-কী, শ্রীলংকারও ওভার পিছু রানের হার ছিল ভারতের চাইতে বেশি। শীর্ষস্থানে ছিল পাকিস্তান (৪.৬৩) তারপর ইংল্যাণ্ড (৪·৫৪), অস্ট্রেলিয়া (৪·৪৬), ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (৪·৪১)।

ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাকিস্তান জয়লাভ করতে পারত। পাকিস্তানের ২৬৬ রানের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৯ উইকেটের বিনিময়ে ২০৩। শেষ উইকেট জুটিতে ডেরেক মারে (৬১ অপরাজিত) ও অ্যান্ডি রবার্টস (২৪ অপরাজিত) যোগ করেন ৬৪ রান। নাটকীয় উত্তেজনার মধ্যে শেষ ওভারের চতুর্থ বলে অ্যান্ডি রবার্ট জয়সূচক রানটি করেন।

ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে একদিনের আসর বলতে দেওধর ট্রফি ও উইনস ট্রফি। কিন্তু দুটো প্রতিযোগিতাতে অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় যে, ভারতের প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়রা খেলার ওপর আদৌ গুরুত্ব দিচ্ছেন না। চার বছর আগে ভারতীয় দলের পক্ষে যাঁরা প্রুডেন‌শিয়াল কাপে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আটজন খেলোয়াড় এবারও অংশ নিয়েছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ভারত হার স্বীকার করে ৯ উইকেটে। নিউজিল্যান্ড আমাদের বিরুদ্ধে জয়ী হয় আট উইকেটে। এমন-কী, ক্রিকেটে যে শ্রীলঙ্কা নেহাতই দুর্বল দল, সেও আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। প্রথম দুটি খেলার কোনোটাতেই ভারত না পেরেছে ওভারপিছু চার রান করতে, না পেরেছে দুশোর উপর রান তুলতে। এই ব্যর্থতার জন্য বেঙ্কট ভারতীয় ব্যাট্‌সম্যানদের দায়ী করেছেন। ব্যাট্‌সম্যানদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ১৯৭৫ সালে আবিদ আলি, ইঞ্জিনীয়ার ও ব্রিজেশ প্যাটেল দলে থাকা সত্ত্বেও আমরা নিউজিল্যান্ডকে হারাতে পারিনি। এবারে মারমুখী ব্যাট্‌সম্যান বলতে ছিলেন কপিলদেব ও ব্রিজেশ। কিরমানি দলে থাকলে কিছু রান করা যেতে পারত। ব্যাট্‌সম্যানরা তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী যা খেলার খেলেছেন, কিন্তু আমাদের বোলাররা ! তাঁরা কি খেলার ওপর কোনো রকম প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন ?

প্রুডেনশিয়াল কাপের ফলাফল অপ্রত্যাশিত নয়। বেঙ্কট নিজেও সেটা জানতেন। হয়তো দলের মনোবল বাড়াবার জন্যে কিংবা দলকে উৎসাহিত করার জন্যে গোড়ায় তিনি আশার বাণী শুনিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে ভারত এখন খেলবে চারটি টেস্ট। এই টেস্টগুলিতে ভারত কেমন খেলে সেটাই অতঃপর দেখার বিষয়।

সুরজিৎ সিং

ভারতীয় হকির শনির দশা

বজ্রসেন

এপ্রিলের শেষে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে দশ দেশের যে আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা হয়ে গেল তাতে পাকিস্তান একরকম 'এলাম, দেখলাম, জিতলাম' করেই জয়ের মুকুট মাথায় পরেছে।

পার্থের প্রতিযোগিতায় ভারত বিজয়ীর সম্মান পাবে, এ-স্বপ্ন নিশ্চয়ই ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে আশাবাদী ব্যক্তিও দেখেননি। কিন্তু সেমিফাইনালে পৌঁছবার আশা অনেকে করেছিলেন। প্রথম দুটি খেলায় যথাক্রমে হল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩—৬ গোলে ও ২—৩ গোলে হেরে যাওয়ায় সে আশা নির্মূল হয়ে যায়। পরে ফ্রান্সকে ৪—২ গোলে ও কানাডাকে ৭—৩ গোলে হারিয়েও শেষরক্ষা করা যায়নি। শ্রেণীবিভাগের খেলায় কেনিয়াকে ৪—১ গোলে হারিয়ে ভারত স্থান-নির্ণয়ের জন্যে লড়াই করে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে। নিউজিল্যান্ডকে ৫—৩ গোলে হারিয়ে ভারত পঞ্চম স্থান পায়।

ভারতীয় হকির কর্মকর্তারা বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিতে তো চান না, উপরন্তু হকির মান-উন্নয়নের চেয়ে দলাদলি ও রাজনীতির কাজটাই বেশি পছন্দ করেন।

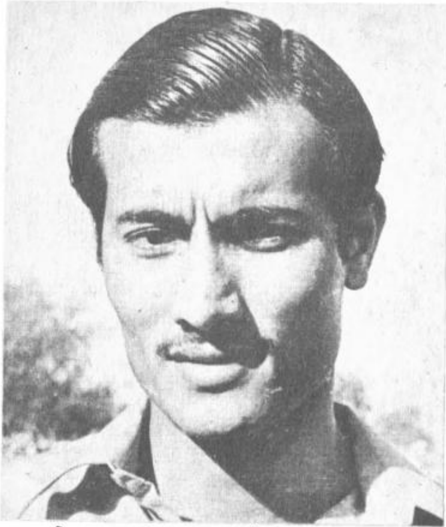

পাক-অধিনায়ক সেলিম শেরওয়ানি

পার্থের প্রতিযোগিতায় ভারতের ক্রীড়া-ধারা এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখেছে। ভারতের গ্রুপটি অপেক্ষাকৃত শক্ত ছিল এ অজুহাত দেখিয়ে লাভ নেই। ভারত জিতেছে কাদের বিরুদ্ধে? ঐ গ্রুপের খেলায় দুর্বল কানাডা ও দুর্বলতর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। ঐ গ্রুপে যাদের জয় যথাক্রমে এক ও শূন্য। এবং প্রতিযোগিতায় স্থান যথাক্রমে সপ্তম ও দশম! কেনিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও ভারত জিতেছে। কেনিয়া শেষ পর্যন্ত অষ্টম স্থান পেয়েছে। আর নিউজিল্যান্ড কাগজে-কলমে অলিম্পিক খেতাবের অধিকারী হলেও তার গৌরব যে কতটা অন্তঃসারশূন্য তা পার্থের প্রতিযোগিতায় চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। ভারত ছ'টি (৪+১+১) খেলায় মোট গোল করেছে ২৫টি, খেয়েছে ১৮টি। এর থেকেই রক্ষণভাগের দুর্বলতা বোঝা যায়।

ভারতের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রাই বা কী এমন খেলেছেন? অধিনায়ক অশোক-কুমার, হরিপাল কৌশিক, গ্রেওয়াল সৈয়দ আলি মাঝে মাঝে হঠাৎ-আলোর ঝলকানি দেখিয়েছেন, তার বেশি কিছু নয়। ভারতের ২৫টি গোলের মধ্যে ১১টি করেছেন সুরজিৎ সিং পেনাল্টি কর্নার থেকে। অর্থাৎ ফরোয়ার্ডরা করেছেন মোট ১৪টি। মনে রাখতে হবে, প্রথম যে দুটি খেলা হারের ফলে ভারত সেমিফাইনালে যেতে পারেনি, সেই দুটি খেলায় ভারতীয় ফরোয়ার্ডরা একটিও গোল করতে পারেনি।

পার্থে পাকিস্তান ছাড়া আর যারা যারা ভাল খেলেছে, তারা হল দ্বিতীয় স্থানাধিকারী অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ড এবং গ্রেট ব্রিটেন। সেই মেক্সিকো থেকে শুরু করে প্রথম স্থান অস্ট্রেলিয়াকে এই চতুর্থ বারের জন্যে এড়িয়ে গেল —মেক্সিকো, মন্ট্রিয়ল, লাহোর (চ্যাম্পিয়ন কাপ) ও পার্থে। কমনওয়েলথ স্টেডিয়ামের হাজার পনের দর্শকের প্রায় সকলেরই সমর্থন পেয়েও অস্ট্রেলিয়া শীর্ষস্থান দখল করতে পারেনি। অবশ্য পাকিস্তান আগাগোড়া যে-রকম দাপটের সঙ্গে খেলেছে, অস্ট্রেলিয়া কোনও খেলাতেই সে-রকম দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারেনি।

দুর্ভাগ্যের শিকার যদি সত্যিই কেউ হয়, সে হল হল্যান্ড। দু দু'বার বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে উঠে হল্যান্ড জিততে পারেনি। বিশ্বকাপ হকিতেও বুয়েনস এয়ারসে পাকিস্তানের কাছে হার স্বীকার করে। আর পার্থে হল্যান্ড ভাল খেলেও ফাইনালে উঠতে পারেনি, কারণ সেমি-ফাইনালেই মুখোমুখি হয় পাকিস্তানের। স্থান নির্ণয়ের খেলায় ৬—৫ গোলে ব্রিটেনকে হারিয়ে হল্যান্ড তৃতীয় স্থান পেয়েছে।

দারুণ খেলেছে ব্রিটেন। স্থানের দিক থেকে চতুর্থ, ভারত পঞ্চম, এ-রকমভাবে ভাবলে ব্রিটেনের সুন্দর খেলার প্রতি ঘোর অবিচার করা হবে। গ্রুপের খেলায় ব্রিটেন পাকিস্তান ছাড়া আর কারও কাছে হারেনি। যে দুটি খেলায় ব্রিটেন হেরেছে সে-দুটি হল সেমি-ফাইনাল ও স্থান-নির্ণয়ের খেলা। গোল করেছে মোট ২৪টি, বিরুদ্ধে গোল হয়েছে ১৫টি। গোলের গড় ধরলে ভারতের থেকে ভাল। ব্রিটেনের তরুণ রাইট ব্যাক বব ক্যাটট্রাল পার্থের প্রতিযোগিতায় আগাগোড়া ভাল খেলেছেন এবং প্রত্যেকটি খেলায় গোল করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজেকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শর্ট কর্নার স্পেশালিস্ট-রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের তিনটি গোলই করেন ক্যাটট্রাল। বিশ্বের এক নম্বর হকি শক্তির বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্বের অধিকারী আর কেউ আছেন কি? মনে হয় না। ●

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

হস্টেলে সুমন

শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়

আশিস খুব আস্তে আস্তে সুমনকে জিজ্ঞেস করল, "পরেশদার গাছের বড় গোলাপটা কি তুই তুলেছিস?"

সুমন মাথা নিচু করে বলল, "হ্যাঁ, ভুল করে তুলে ফেলেছি।"

আশিস বলল, "পরেশদা সক্কলকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করছেন। এখন তাহলে তুই কী বলবি?"

সুমন বলল, "বলব, হঠাৎ তুলে ফেলেছি।"

আশিসও কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বলল, "তোকে কিন্তু পরেশদা খুব বকবেন, বেশি রেগে গেলে শাস্তিও দিতে পারেন।"

সুমন মন খারাপ করে ভাবছিল, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন পরেশদা যদি বেশি রাগারাগি করেন, তা হলে তার আর কীই বা করার আছে! অবশ্য বলা যায় না, পরেশদার ব্যাপার তো, একটু-আধটু বকুনি দিয়ে ছেড়েও দিতে পারেন। কারণ, পরেশদা যে-দুটি বিষয় পড়ান, সে-দুটিতে ওই সব চাইতে বেশি নম্বর পেয়েছে।

আশিস চলে যাওয়ার পরে সুমন দক্ষিণের বড় বারান্দায় চলে এল। এইটেই হস্টেলের সব চাইতে বড় বারান্দা, তাই সবাই বড় বারান্দা বলে। এখান থেকে স্কুল-বাড়ি, খেলার মাঠ, বাঁধানো পুকুর, নারকেল-বাগান, কৃষ্ণচূড়া—সব স্পষ্ট চোখে পড়ে। এখানে এলে ও কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়, বাড়ির কথা মনে পড়ে বার বার। মনে পড়ে মায়ের কথা... বাবার কথা...।

সুমন এই বছরই ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সে উঠেছে। ফার্স্ট না হলেও রেজাল্ট খারাপ হয়নি। তিনটে বিষয়ে সেই সব চাইতে বেশি নম্বর পেয়েছে।

স্কুলের কাছাকাছি হস্টেলে সুমন থাকে। এত ছেলে, এত বন্ধু, তবু সুমনের একা লাগে! এই যে পরেশদা—উনি বকুনিই দিন আর শাস্তিই দিন, সুমন তো জানে উনি কত ভালবাসেন ওকে! সেবার ও যখন অসুস্থ হয়ে বিছানার চাদরে বমি করে ফেলেছিল, তখন পরেশদাই সেই চাদর নিজের হাতে পরিষ্কার করেছিলেন। একটুও ঘেন্না করেননি, অথচ সুমনের লজ্জা করছিল।

সুমনের কোনো ভাইবোন নেই। বাড়িতে ও ছাড়া শুধু মা আর বাবা। তাও দুজনেই আবার চাকরি করেন। বাবা অফিসে, মা স্কুলে। স্কুলের সময়টুকু বাদ দিলে সারাক্ষণ সুমন একলা-একলা।

কোনো বন্ধুর সঙ্গে খেলার জন্যে ও তখন অধীর হয়ে থাকত। এখন এই হস্টেলে কত বন্ধু, অথচ সবকিছু কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। আসলে মা-বাবা থাকেন না তো. তাই এমন মনে হয়।

এই যে পরেশদার গোলাপটা ও তুলে ফেলেছে, সেও মায়েরই জন্যে। মা লাল গোলাপ খুব ভালবাসেন।

গত রবিবার মা যখন এসেছিলেন, সুমন ওঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গোলাপ গাছের কাছে। মা তো ভীষণ অবাক—এত বড় গোলাপ!

সুমন বলেছিল. ''মা. এই ফুলটা নিতে তোমার ইচ্ছে করছে না?''

মা হাসলেন. "ইচ্ছে করবে না কেন? তবু গাছের ফুল গাছেই সুন্দর।"

কতদিন বাড়ি যায়নি ভাবলেই সুমনের মন খারাপ হয়ে যায়। মা অবশ্য প্রতি রবিবার আসেন। কিন্তু মাকে অল্প সময়ের জন্যে পেয়ে সুমনের মন আরও খারাপ হয়ে যায়।

কোনোরকমে চোখের জল চেপে সুমন নিজের ঘরে ফিরে এল। আর এসেই অবাক হয়ে দেখে, আশিস. অমল আর সুমিতের চোখে জল। আশিস আবার ওদের মতো মনে মনে কাঁদতে পারে না। ও একেবারে হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলল, "শক্তিদা. শক্তিদা চলে যাচ্ছেন।"

"শক্তিদা চলে যাচ্ছেন?"

"কেন. তুই জানিস না শক্তিদা অন্য এক স্কুলে চলে যাচ্ছেন।"

সুমন তাকিয়ে দেখল শক্তিদার ঘরে সত্যিই খুব ভিড়। সঙ্গে সঙ্গে ও নীচে নেমে এল। আসতেই পরেশদার একেবারে সামনা-সামনি। গোলাপ তোলার কথাটা মনে হতেই ও একটু কুঁকড়ে গিয়ে বলল. "পরেশদা, গোলাপটা আমি...।"

পরেশদা সে কথা গায়েই মাখলেন না। অন্যমনস্ক হয়ে বললেন. "ও. আচ্ছা—আচ্ছা, আর অমনটি করিস নে ভাই।"

ভিড় একটু পাতলা হতে শক্তিদার কাছে গিয়ে সুমন বলল, "আপনি নাকি চলে যাচ্ছেন?"

শক্তিদা সুমনের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "চলে যাচ্ছি কী রে? তোদের ছেড়ে থাকতে পারি! আমি তো আবার আসব। চিঠি দিবি কিন্তু! ভুলবি না তো?"

শক্তিদা চলে গেলেন আর-এক স্কুলে। তারপর থেকে সুমন আর ওই ঘরের দিকে তাকাতেই পারে না। সুমন দেখে, শক্তিদার নিজের হাতে লাগানো চাঁপাগাছটা ফুলে ফুলে ভরে গেছে, অথচ শক্তিদা দেখতে পাচ্ছেন না। সুমন ভাবে, শক্তিদা নেই তবু ফুল ফোটে রোজ। ফুলের কি কোনো কষ্ট হয় না?

এবার সুমনদের স্কুলের রেজাল্ট খুব ভাল হয়েছে। বিশেষ করে হস্টেলের ছেলেদের। প্রায় সকলেই ফার্স্ট ডিভিশন। দুজন আবার প্রথম দশজনের মধ্যেও আছে। এত ভাল ফল করার জন্যে মাস্টারমশাইদের মুখগুলোও চাপা আনন্দ আর গর্বে ঝকঝক করছে। প্রবীরদা সব্বাইকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। সুমনেরও খুব ভাল লাগছে। সে তো এই স্কুলের, এই হস্টেলেরই ছেলে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে সুমনের। সে যে কবে এমনি করে পাশ করে বাড়ি ফিরবে!

নারকেল গাছের হাওয়া খেতে খেতে সুমনের চোখ হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। এ কী! এবারের সব চাইতে বেশি-নম্বর-পাওয়া সুনীলদার চোখে জল কেন? কেন কাঁদছেন? নাকি সত্যি সত্যি ভাল রেজাল্ট হয়নি। ও ক্লাস নাইনের সৈকতকে জিজ্ঞেস করল, "সুনীলদা কাঁদছেন কেন সৈকতদা?''

"কষ্ট হচ্ছে, তাই কাঁদছে।"

"কষ্ট! কষ্ট কিসের?"

"তুই কী ছেলে রে সুমন! এতগুলো বছর কাটিয়ে যাওয়ার সময় কষ্ট হবে না?"

শুনে সুমনের বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। এই নারকেল গাছের হাওয়া, এই কৃষ্ণচূড়ার ছায়া, বনতুলসীর ঝাড়—সবাই যেন কেমন করে ওর আপনারজন হয়ে গেছে।

স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাশ করার পরে ও যখন হস্টেল থেকে চলে যাবে তখন কি সুনীলদার মতো ওর চোখও জলে ভরে উঠবে! কত দূরের কথা, কিন্তু কথাটা ভাবতে গিয়ে সুমনের চোখে জল এসে গেল এখনই।

ছবি অলোক ধর

সাদা হাতের থাবা

প্রসিত রায়চৌধুরী

পানামা যোজকের কাছে দারিয়েন উপসাগরের তীরে সোনা আর মুক্তোর ছড়াছড়ি। কথাটা আগুনের মতো ছড়িয়ে গেল। আর দেখতে দেখতে ছুটে এল অনেকে। এদের বেশির ভাগই স্পেনের জলদস্যু। তখন বছর সাতেক মাত্র আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছে।

ভাস্‌কোন্‌নেজ বালবোর কানেও কথাটা গেল। লোকটা ভবঘুরে। দেনার জ্বালায় পালিয়ে বেড়ায়। সান-ডোমিন্‌গো বন্দরের একটা জাহাজের খালি পিপের মধ্যে বসে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসে পড়ল দারিয়েন উপসাগরের কূলে। তারপর তারই মতো কয়েকজন লোক জুটিয়ে আরম্ভ করল লুঠপাট। উপার্জন মন্দ হল না। কিন্তু বিরোধ বাধল সোনা ভাগ করতে গিয়ে। বালবোর ছোরার ঘায়ে মারা গেল দুজন। বালবোও আহত হল।

বাল্‌বোর পথপ্রদর্শক ছিল স্থানীয় এক সর্দারের ছেলে। সাহেবেরা তাকে 'ইণ্ডিয়ান' বলত। কারণ, কলম্বাস ইণ্ডিয়া আবিষ্কার করতে গিয়েই তো আমেরিকা পোঁছে যান। তাই আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা তাদের কাছে ছিল 'ইণ্ডিয়ান'। ছেলেটি অবাক হয়ে সাহেবদের মারামারি দেখছিল। সে এবার মুখ খুলল, "তোমরা এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করো!" মূর্খ বালবো রেগে বলল, "কী বলতে চাস তুই?"

ছেলেটি বললে, "সোনা নিয়েই তো তোমাদের ঝগড়া। আমি তোমাকে একটা দেশের খবর দিচ্ছি। সেখানে গেলেই তুমি যত ইচ্ছা সোনা পেতে পার। গোঁয়ার বালবো ছেলেটির বুকে তলোয়ার ঠেকিয়ে বলল, "শিগ্‌গির বল্‌ কোথায় সে দেশ?"

ছেলেটি বললে, "এখান থেকে ঠিক ছ' দিনের পথ। পাহাড় পেরিয়ে যেতে হবে। দেখবে নদীগুলো পাহাড় থেকে বেরিয়ে বিরাট এক জলাশয়ে পড়ছে। নদীর জল হলুদ, সোনার গুঁড়ো মেশানো। সে দেশের লোকেরা সোনার থালায় খায়, সোনার গেলাসে জল খায়।"

শুনে বালবোর চোখ কপালে উঠল। গরিবের ছেলে, এবার সে কোটিপতি হয়ে যাবে।

এটুকু সে, বুঝতে পারলে যে, আণ্ডিস পাহাড় পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে তাকে পোঁছতে হবে।

শ'দুয়েক লোক নিয়ে বালবো রওনা হল। পথ বড় ভয়ংকর। ঘন জঙ্গলে ভরা পাহাড়ি পথ। হিংস্র জন্তুর আক্রমণে আর হঠাৎ-এসে-পড়া ইণ্ডিয়ানদের বিষ-মাখানো তীরে অনেকে মারা গেল। কিছু লোক পালিয়েও গেল৷ প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে পোঁছে বালবো একটা জাহাজ জোগাড় করল। বাকি পথটা জাহাজেই পাড়ি দেবে। কিন্তু তা আর হল না। রাতের অন্ধকারে গোপন শত্রুর আক্রমণে বালবো মারা গেল।

বালবো মারা গেল, কিন্তু তার সোনার দেশের কথা আমেরিকা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের ঘরে ঘরে। বিখ্যাত নাবিক ম্যাগেলান স্পেনের রাজার সাহায্যে পাঁচখানা জাহাজ নিয়ে বেরুলেন এই সোনার দেশের

সন্ধানে। কিন্তু মাঝদরিয়ায় নিহত হলেন তিনি।

ফ্রান্সিস্কো পিজারো বলে বেঁটেখাটো একটা লোক স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসের সঙ্গে দেখা করে বলল যে, সে বালবোর সঙ্গী হয়ে সোনার দেশ খুঁজতে গিয়েছিল। তাকে জাহাজ আর অর্থ দিলে সোনার দেশের সোনার তাল সে স্পেনে নিয়ে আসবে।

স্পেনের রাজা রাজি হয়ে গেলেন। তাঁর কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে পিজারো সোনার দেশে পৌঁছে গেল।

এই সোনার দেশের নাম পেরু। এই রাজ্যের শাসনকর্তাকে বলা হত ইন্কা। এর অর্থ সূর্যের সন্তান। এ-রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল কুজ্কো।

সূর্যসন্তানরা পেরুর প্রাচীন সভ্য জাত চিমু, নাজকা, টিয়াহুয়ানকে পরাজিত করে এক বিশাল রাজ্য গড়ে তোলে। সারা রাজ্য জুড়ে তৈরি করে সুরম্য প্রাসাদ আর দুর্ভেদ্য দুর্গ।

ইনকাদের প্রাসাদের দেয়ালে সোনারুপোর কাজ। তাঁদের থালাবাটিও ছিল সোনারুপো দিয়ে তৈরি। সূর্যদেবের মন্দিরের দেয়াল ও আসবাবপত্র ছিল সোনার। পেরুর লোকেদের কাছে সোনার দাম অর্থমূল্যে কষা হত না। সোনাকে তারা বলত সূর্যদেবের চোখের জল, পবিত্র জিনিস।

১৫৩২ সালের হেমন্তকাল। লোভী নিষ্ঠুর পিজারো এসে দাঁড়াল সুসভ্য ইনকা সাম্রাজ্যের দ্বারে। ইনকা অধিপতি আতাহুয়াল পাকে অশ্বারোহী সৈনিক মারফত খবর পাঠাল পিজারো। স্পেনের দূত পরিচয় দিল নিজের।

আতাহুয়াল পা পিজারোকে কাসামার্কা নগরীতে আমন্ত্রণ জানালেন। ওখানে উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করছিলেন ইন্কা অধিপতি। ইন্কারাজের ঐশ্বর্য দেখে পিজারো প্রতিনিধি হারনান্ডো ডিসোটোর কথা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। দেখল, রাজার আসন নিরেট সোনার তৈরি। কয়েক লক্ষ টাকা তার দাম। ইন্কা-রাজ ডিসোটোকে বললেন, পিজারো যেন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। উত্তম প্রাসাদের যে কোনো একটিতে তিনি থাকতে পারেন।

কিন্তু পিজারো তো আতিথ্য নিতে আসেনি।

দোভাষী মারফত পিজারো প্রস্তাব জানাল যে, ইনকারাজ আতাহুয়াল পাকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। আর স্বীকার করতে হবে স্পেনরাজের অধীনতা।

ইনকারাজ দুটি প্রস্তাবই ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, "সূর্য-সন্তানরা পৃথিবীর যে-কোনো রাজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

পিজারো এরই অপেক্ষায় ছিল। পূর্ব-ব্যবস্থা-মতো গলায় জড়ানো সাদা রেশমের টুকরোটা হাওয়ায় ওড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের ঘোড়সওয়াররা বন্দুক ছুঁড়তে শুরু করল। পেরুর মানুষের কাছে বন্দুক তখনও অজানা। মারা পড়ল অনেকে। সূর্যের সন্তান আতাহুয়াল পা বন্দী হলেন।

পেরুবাসীরা তাদের রাজার মুক্তির জন্য নিয়ে এল সুন্দর কারুকার্য করা সোনারুপোর বাসনপত্র। সোনার তৈরি গাছ, পাখি, মানুষ। লোভী, মূর্খ স্পেনের সেনারা সেগুলির শিল্পমূল্য না বুঝে গালিয়ে সোনার তাল করে নিল। জীবন্ত পুড়িয়ে মারল ইনকা-রাজকে। তারপর শুরু হল নারকীয় তাণ্ডব। লুঠ, হত্যা আর সোনার জন্য অত্যাচার। দেড় হাজার বছরের সুপ্রাচীন এক সভ্যতা নষ্ট হয়ে গেল সাদা হাতের থাবায়।

ছবি দেবাশিস দেব

ভলগা

ভলগা নদীর নাম তোমরা সকলেই নিশ্চয় শ্নেছ। সোভিয়েত রাশিয়ার বিখ্যাত এই নদী ইউরোপের দীর্ঘতম নদী। এই নদীটি লম্বায় ২২৯৩ মাইল বা ৩৬৯০ কিলোমিটার। নদীটির অববাহিকার আয়তন ৫৩২,৮১৮ বর্গ মাইল বা ১,৩৮০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলেও এই নদী রাশিয়ার সবচেয়ে গর্ত্বপূর্ণ নদী—ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে দেখতে গেলেও এর গর্ত্ব কম নয়। সোভিয়েত দেশের তিন ভাগের দ্ই ভাগ বাণিজ্যই এই নদীর জলপথের সাহায্যে করা হয়। রাশিয়ার বিশাল সমভূমির ওপর দিয়ে যাতায়াত করার জন্যও এই নদীপথ ব্যবহার করা হয়। সোভিয়েত দেশের চার ভাগের এক ভাগ লোক এই নদীর তীরেই বসবাস করে। নদীটি ভলগই পাহাড় থেকে বেরিয়েছে।

এই নদী ছোটবড় অনেকগ্লি হ্রদের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে। এদের মধ্যে দ্টি বড় হ্রদ হল—ভেসল্গাপেনো এবং ভলগো। ভলগো হ্রদ থেকে বেরিয়ে ভলগা নদী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বেঁকে গেছে। এর পরে রেজেভ শহর ছাড়িয়ে এই নদী উত্তর-পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে কালিনিন শহর পর্যন্ত বয়ে গেছে এবং তারপর গিয়ে মিশেছে বিশাল রাইবিনস্ক জলাধারে। রাইবিনস্ক-জলাধার থেকে বেরিয়ে এই নদী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গোর্কি শহর পর্যন্ত বয়ে গেছে এবং তার পর আবার গিয়ে মিশেছে একটি বিরাট জলাশয়ে। এইখানেই এসে মিশেছে ভলগার ব্হত্তম উপনদী কামা। এই কামা নদীও বেশ বড় নদী। লম্বায় ১,২৬১ মাইল বা ২০৩০ কিলোমিটার। ভলগা নদীর প্রো অববাহিকার পাঁচ ভাগের দ্'ভাগ জ্ড়ে আছে কামা নদীর অববাহিকা। এখানে ভলগা নদী একটা তীব্র বাঁকের স্ষ্টি করেছে—এই বাঁকের নাম সামারাস্কা ল্কা। জিগ্লি পাহাড়ের পূর্ব দিক থেকে ভলগোগ্রাদ পর্যন্ত ভলগা নদী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বয়ে গেছে। ওকা নদীর সঙ্গে মেশবার পর থেকেই এই নদীর দক্ষিণ তীর কয়েক শো ফ্ট পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠেছে এবং বাঁ দিকে আছে নিচু

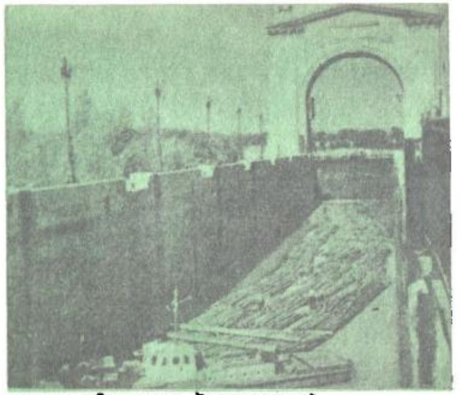

ভল্গা নদীর খালের উপরে লক্গেট

প্লাবন ভূমি। ভলগোগ্রাদের পর ভলগা নদী আবার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বেঁকেছে এবং ক্যাস-পিয়ান সাগরের উত্তর তীরে এসে পৌঁছেছে। ভলগা নদী নীচের দিকে যেখান দিয়ে বয়ে গেছে সেখানে অনেক ঘোড়ার খ্রের মতো হ্রদ, বিচ্ছিন্ন বাঁক প্রভৃতি স্ষ্টি করেছে। ভলগা নদী মোহনায় অস্ত্রাখান শহরে বিরাট এক বদ্বীপ স্ষ্টি করে ক্যাসপিয়ান সাগরে গিয়ে পড়েছে।

ভলগা নদীতে অনেক বাঁধ বাঁধা হয়েছে এবং কৃত্রিম জলাধার তৈরি করা হয়েছে। ভলগো হ্রদের নীচের ছোট বাঁধটি তৈরি করা হয়েছিল ১৮৪৩ সালে। তারপর এই নদীপথের অনেক উন্নতি করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই নদীর বাঁধ ও জলাধারগ্লিকে পৃথিবীর অন্যান্য নদীর ব্হৎ বাঁধ ও জলাধারের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

ভলগা নদীর ওপরের অংশে নভেম্বর মাসে বরফ জমতে আরম্ভ করে এবং নভেম্বরের শেষাশেষি প্রোপ্রি জমে যায় এবং নীচের দিকের অংশ জমে যায় ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি।

খাল কাটার ফলে ভলগা নদীতে নৌচলাচল অনেক বেড়ে গিয়েছে। মস্কো ক্যানাল তৈরি হওয়ার ফলে নদীপথে মস্কোতে যাতায়াত করা চলে। ভলগা ও ডান নদীকে য্ক্ত করেও খাল কাটা হয়েছে। ভলগার উচ্চভাগকে বাল্টিক সাগরের সঙ্গে য্ক্ত করা হয়েছে বহ্কাল আগেই। ভলগা থেকে এখন খালপথে সোভিয়েত রাশিয়ার চতুর্দিকের সম্দ্রেই যাওয়া যায়।

দিদিমণি

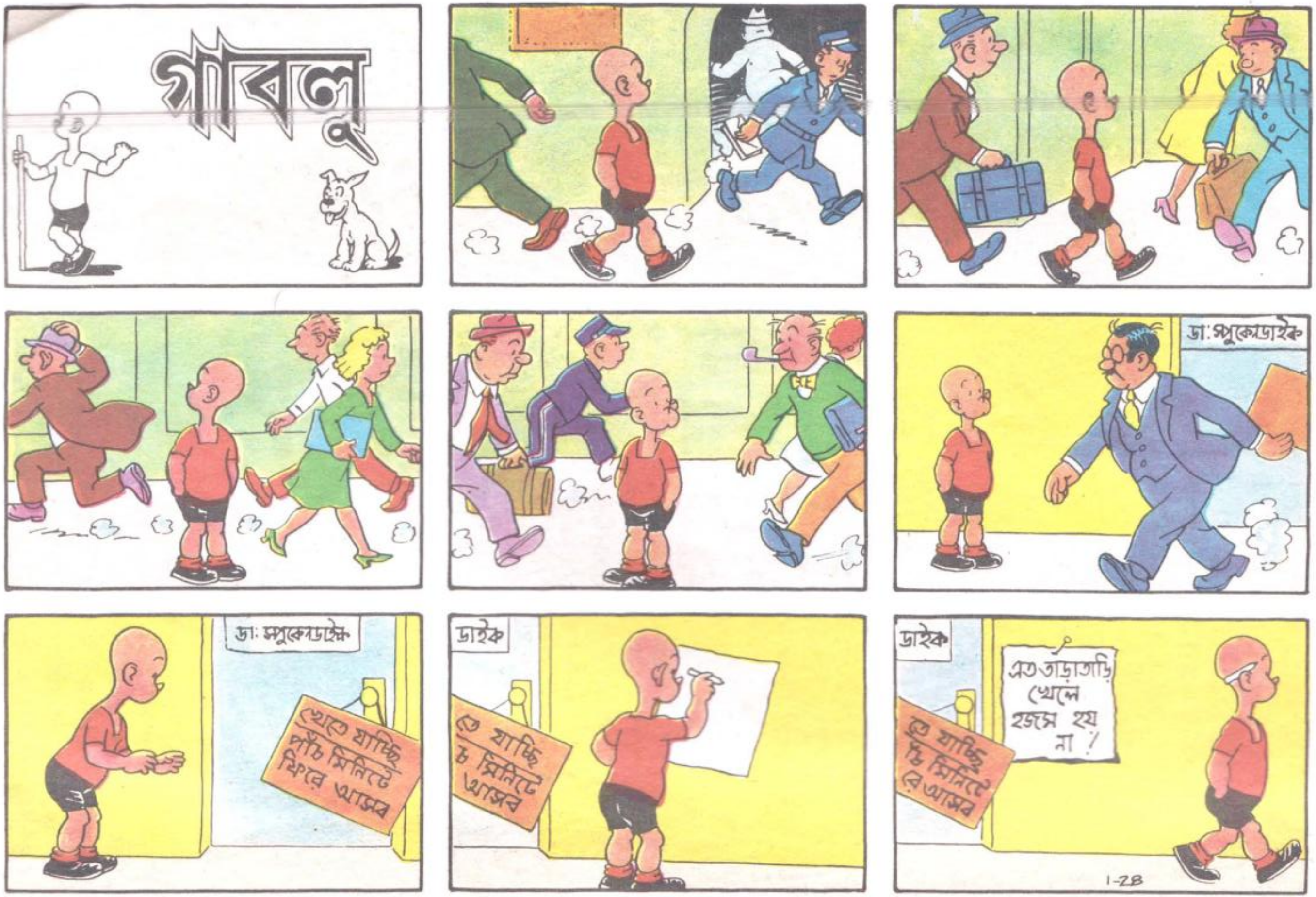

গাবলু
ডা: স্পুকেডাইক
ডা: স্পুকেডাইক
খেতে যাচ্ছি
পাঁচ মিনিটে
ফিরে আসব
ডাইক
তে যাচ্ছি
চ মিনিটে
আসব
ডাইক
তে যাচ্ছি
চ মিনিটে
রে আসব
এত তাড়াতাড়ি
খেলে
হজম হয়
না!
1-28

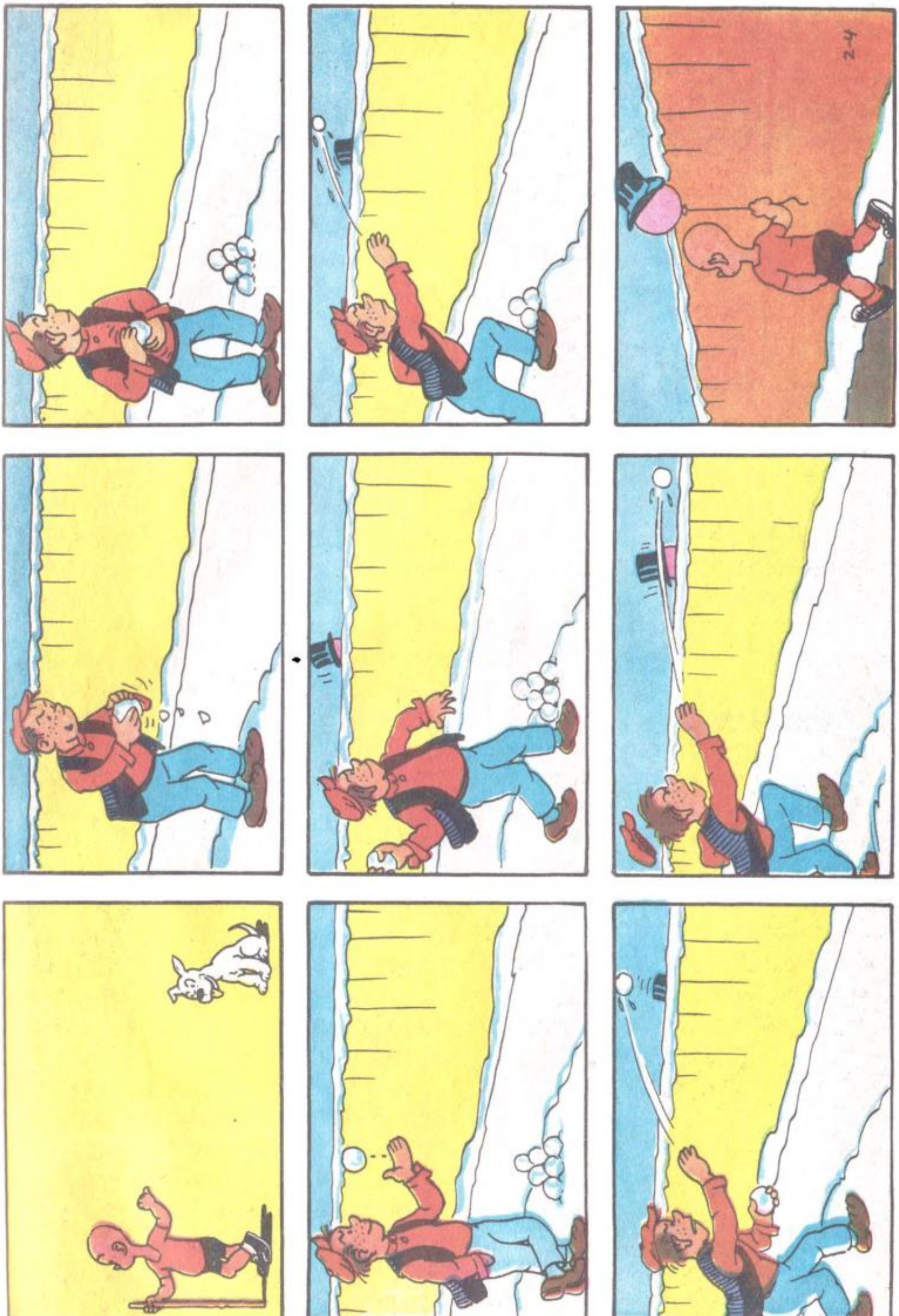

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি

আনন্দ বাগচী

রাস্তায় পা দিয়েই চমকে উঠলাম, যেন পৃথিবীর সবচেয়ে খরস্রোতা নদীর উজানে চলেছি, এটা যেন রূপকথার সেই অলৌকিক নদী, যার ওপারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আমাদের বাল্য আর কিশোরকাল, রোদ্দুরের আভায় ঝিকমিক করছে। কয়েক কদমের মামলা, পৌঁছে যাব, এখুনি পৌঁছে যাব।

স্টিকিং প্লাস্টারের মতো কোন্ নিচু ক্লাস থেকে গায়ে-গায়ে সেঁটে-থাকা বন্ধু মদন আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। "কিস্যু বদলায়নি। তিরিশ বছর আগে যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম তেমনটিই আছে।"

ঘাড় নেড়ে সায় দিতে গিয়ে থমকে গেলাম, কিছুই বদলায়নি একথা ঠিক না। রাস্তার উল্টো দিকে বটতলার বইয়ের দোকানগুলো ম্যাজিকের তাসের মতো ভ্যানিশ। আমাদের ছেলেবেলার গায়ে-কাঁটা-তোলা রহস্য-রোমাঞ্চ প্রহেলিকা কাঞ্চনজঙ্ঘা বিভীষিকা সিরিজের দুর্ধর্ষ মলাট-গুলোর হাতছানি মুছে গেছে। এখন সেখানে অপেরা-যাত্রার অফিস ঘর।

উত্তর কলকাতার আদ্যিকালের সড়ক চিৎপুর রোডে যেখানে গরানহাটা স্ট্রীট এসে মুখ থুবড়ে পড়েছে, সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোনাকুনি রাস্তা পেরোলেই সেই লোহার সিং-দরোজা, যার মাথার ওপর ফুলবাহার মাধবীলতার ছাউনি আর যার ওপিঠে লাল ইঁটের প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িটা, গৌরমোহন আঢ্যর বিখ্যাত বিদ্যালয়, কাগজে কলমে পাক্কা দেড়শো বছর পরমায়ু পেরোনো ওরিয়েন্টাল সেমিনারি। ১৮২৯ সালের ১ মার্চ এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অবশ্য স্কুলটা গোড়ায় ছিল অন্যত্র, বার-দুই ভাড়াবাড়িতে ঠাঁই বদল করে ১৮৩৬ সালে এখানে উঠে এসেছিল। এখানে ঠিক এই জায়গাতে তখন ছিল গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ি। ইতিহাসে বাড়ির নামটা বিখ্যাত হয়ে আছে অন্য কারণে। ১৮২৭ সালে এই বাড়িতে হিন্দু কলেজের জন্ম হয়। মাত্র কুড়ি জন ছাত্র নিয়ে। তারপর হিন্দু কলেজ এই বাড়ি ছেড়ে গেলে আলেকজান্ডার ডাফ তাঁর স্কুল খোলেন, সে স্কুল পরে স্কটিশচার্চ কলেজে পরিণত হয়। ডাফসাহেব অন্য বাড়িতে উঠে গেলে ১৮৩৬ সালে গৌরমোহন এই বসাকবাড়ি তাঁর স্কুলের জন্য ভাড়া নেন। ওই বছরই ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে একটি আদর্শ নার্সারি স্কুল খোলা হয়েছিল ডাব্লিউ এইচ পার্কিনস সাহেবের পরিচালনাধীনে। তিন থেকে ছ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুরা এখানে বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করত। 'নেটিভ ইনফ্যান্টস স্কুল' নামক এই শিশু বিদ্যালয়টি সম্ভবত ভারতের প্রথম নার্সারি স্কুল।

গ্রীষ্মের ছুটি চলেছে। ফটক দিয়ে আমি আর মদন গুটি-গুটি ভেতরে এসে দাঁড়ালাম, নাবালক দুটি ছাত্রের মতো।

"মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।"

কবিতার লাইন দুটো আবৃত্তি করতে করতে এক বিচিত্র মূর্তি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল, "কী, চেনা লাগে? এই স্কুলেই তো?"

স্কুল-বাড়ির সামনে দেড়শো বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে সদ্য তৈরি রবীন্দ্রনাথের স্টাচুর সামনে দাঁড়িয়ে মদন সবে বলতে শুরু করেছিল, "নিজের ইস্কুলকে, ইস্কুলের বন্ধুবান্ধবকে মানুষ কক্ষনো ভুলতে পারে না। স্কুলের পরে তো কত আসে যায়, কলেজ ইউনিভার্সিটি, আপিসটাপিস —কিন্তু সে সব কতটুকু দাগ রেখে যায় আমাদের জীবনে? এই রবি ঠাকুরও"—বাধা পড়ল। পিপের মতো বর্তুলাকার চেহারা, মাথায় সাদা-কালো ঠাসবুনোন চুল কদম ছাটা, ঠোঁটের ওপর যেন ইয়া পুরুষ্টু একজোড়া কাঁকড়াবিছে মুখো-মুখি স্থির হয়ে আছে, ছুঁচলো লেজের ডগায় মারাত্মক মোচড়। বিস্ময়কর মূর্তির মুখ দিয়ে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা না বেরোলে একে ঘুণাক্ষরে বাঙালি ভাববার কোনো কারণ ছিল না। লোকটা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, পরনে ভোরে-দৌড়নোর সাদা খাটো প্যান্ট শার্ট, কেডস জুতো।

মদন মনে মনে বিরক্ত হয়েছিল, বলল, "না স্যার, এই স্কুলে নয়। এই লাইন দুটো রবি-ঠাকুরের আদ্যিকালের ফরমাশি কবিতা হলেও লেখা হয়েছিল নর্মাল স্কুলে পড়ার সময়।"

আমি বললাম, "ওরিয়েন্টাল ওঁর জীবনে প্রথম স্কুল, যদিও অল্প দিনের জন্যে। এই স্কুলে পড়ার সময় তিনি কবিতা লেখেননি বটে কিন্তু ইস্কুল খুলেছিলেন।"

"ইস্কুল খুলেছিলেন...হেঁ-হেঁ..." আগন্তু-

কের মুখে যেন অবিশ্বাসের হাসি।

মদন বিষম চটে গিয়ে বলল, "হেঁ...হেঁ... হেঁ, জীবনস্মৃতিটা একটু পড়ে দেখবেন।"

আমি বললাম, "জোড়াসাঁকো-বাড়ির বারান্দার একটি বিশেষ কোণের কাঠের রেলিঙগুলো ছিল রবি ঠাকুরের ছাত্র। দুর্দান্ত ঠেঙানির ফলে সেগুলো বেশি দিন ক্লাসে টিকতে পারেনি। ফলে সেই খালি জায়গায় লোহার রেলিঙ ভর্তি হয়, নতুন ছাত্র আর কী।"

পায়ে পায়ে কখন আমরা স্কুলবাড়ির পেছনে লিয়ন সাহেবের খেলার মাঠের সামনে এসে পড়েছিলাম। সেই পামগাছে ঘেরা সুন্দর খেলার মাঠটির যে দশা হয়েছে দেখে চোখে জল আসে। নতুন করে সংস্কার করার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু আগামী বছর দুয়েকের মধ্যে এ-মাঠে খেলা যাবে বলে মনে হয় না। আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে ১৮৭৯ সালে বসাকদের বাড়িটি কেনা হলেও, ভেঙে নিজস্ব নতুন বাড়ি তৈরি হল অনেক পরে, ১৯১৫ সালে এই খেলার মাঠ কেনার সময়ে। গৌরমোহন স্কুলের এই পরিণতি দেখে যেতে পারেননি। শিক্ষক এবং সংগঠক-পরিচালক হিসাবে আঢ্য মশাইয়ের তুলনা ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে রামমোহন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির পাশাপাশি তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। উপযুক্ত ইংরেজ পণ্ডিতজনকে তিনি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করেছিলেন। বলতে গেলে এই স্কুলই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, তাঁর তপস্যা। বিত্তবান না হয়েও একজন মানুষের একক প্রচেষ্টায় এই স্কুল হিন্দু কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল। এই স্কুলের জন্যেই তাঁকে অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। শ্রীরামপুরে একজন ইংরেজ শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেরার সময় বালিখালের কাছে নৌকাডুবিতে প্রাণ হারান গৌরমোহন। কিন্তু মাত্র ষোল বছরের সুযোগ্য পরিচালনায় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ছাত্র সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল আটশো। সেটা ১৮৪৫ সালের কথা। আজ ওরিয়েণ্টালের ছাত্র গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন, কীর্তিমান ও খ্যাতিমান হয়েছেন। অন্তত একশো জন ছাত্রের নাম করা যেতে পারে, যাঁদের নাম শুনলে বাঙালি মাত্রেই চিনতে পারবেন। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত, রসরাজ অমৃতলাল বসু, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কবি-সমালোচক প্রিয়নাথ সেন, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত থেকে শুরু করে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, কৈলাস বসু, নবকৃষ্ণ ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, খেলাতচন্দ্র ঘোষ, ডব্লিউ সি ব্যানার্জি, স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি, স্বামী অভেদানন্দ-প্রমুখ।

যে স্কুল এত মনীষীর স্মৃতি বহন করে আজ দেড়শো বছর অতিক্রম করল তার যাত্রা এত সহজে থামবে না। যত প্রতিকূলতাই আসুক, আরও কয়েক শতাব্দীর মানুষ তার মুখ চেয়ে বসে থাকবে একথা নিশ্চিত।

পাঁচ বন্ধু

স্কুলে আমাদের পাঁচ বন্ধুতে খুব ভাব। আমাদের ভাব দেখে স্কুলে সবাই আমাদের বলে পাঁচ বোন। আমাদের ভাব দেখে বাপিও খুব খুশি। বন্ধুদের নাম দু' একদিন না করলে বাপি বলে, "কী রে, তোদের কি আড়ি হয়ে গেল। চল্ আবার ভাব করিয়ে দিই।"

আমরা ক্লাসে এক জায়গায় বসি। টিফিনে গল্প করি। আর, প্রত্যেকে এক-একদিন সবাইকে টিফিন খাওয়ায়। সুমনা, ডেইজি, অলি, লতা ও আমি একদিন ক্লাস চলার সময় খুব জোরে জোরে গল্প করছিলাম। দিদিমণি বকে আমাদের আলাদা-আলাদা জায়গায় বসিয়ে দিলেন।

আমরা খুব কষ্ট পেলাম। আমাদের মনমরা দেখে দিদিমণি তখন আবার আমাদের এক জায়গায় বসিয়ে দিলেন। আমরা আনন্দে নেচে উঠলাম।

অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (বয়স ১২)

নস্যিখুড়ো

ওপাড়াকার ঘোষাল বুড়ো
আমরা বলি নস্যি-খুড়ো।
রোজ ভোরে দাওয়ায় বসে
আচ্ছা করে নস্যি ঘষে।
তারপর তার গানের পালা
যখন হয় সকালবেলা।

অরূপকুমার দে (বয়স ১২)

ছবি এঁকেছে **রূপকথা রায়** (বয়স ৭)

ছবি এ'কেছে **রণজিৎ সিংহ** (বয়স ১৫)

জোনায় কিছুক্ষণ

যখন সাঁওতাল গ্রামের মধ্যে দিয়ে কিছু পথ হে'টে জোনা ফলস্-এর সীমানার ধারে পে'ছিলাম তখন সূর্য ঠিক মাথার উপরে কিরণ দিচ্ছে। চোখের সামনে দিয়ে পাহাড়ি পথ গাছপালার ব্যূহ ভেদ করে ঢালু হয়ে নেমে গেছে জোনা ফলস্-এর দিকে।

সেই পথ দিয়ে কিছুদূর যাবার পর চোখে পড়ল কিছুটা বালির চর। কিন্তু চোখ আর একটু পাশে ফেরাবার পর দেখতে পেলাম পাহাড়ের উপর থেকে শীর্ণ, শীতল জলের ধারা প্রথমে ধীরে ধীরে এবং পরে বড়-বড় পাথরের চাতালের উপর দিয়ে সশব্দে ফেনিল লহরী তুলে মিশেছে মাটির বুকে। এই দুরন্ত জলরাশি মিলিত হয়েছে শোন নদের সঙ্গে। পাথরের খাঁজের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট মাছের ঝাঁক খেলা করে বেড়াচ্ছে আর স্থানীয় আদিবাসী ছেলেমেয়েরা ছে'ড়া গামছা দিয়ে সেগুলি ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। তাদের কারুর কারুর বাড়ি হয়তো আবার জোনা পেরিয়ে দূর-দূরান্তর গ্রামে। তাদের মা-বাবারাও কেউ কেউ এসেছে মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে, আবার কেউ কেউ বন থেকে ঝুড়ি ভর্তি করে ফল পেড়ে নিয়ে এসেছে এই আশায়, যদি দর্শকদের কাছে বেচে কিছু পয়সা রোজগার করা যায়।

কেউ কেউ আবার ফল বেচে কিছু পয়সা রোজগার করে দু একটা মাছ ধরে কাঠ কুড়িয়ে বুনো লতাপাতা দিয়ে আঁটি বে'ধে খুশি মনে ফিরে যাচ্ছে গ্রামের দিকে। তারা খুবই দরিদ্র। দেখে মনে হয়, তাদের একটু নুন-ভাত পর্যন্তও জোটে না। অথচ তারা কী সরল, কী সুন্দর। কারও একটু রাগ দুঃখ পর্যন্ত নেই। চারধারে বন জঙ্গল, খাড়াই রাস্তা এক জায়গায় উপরের দিকে উঠে গেছে। মাঝখান দিয়ে শান্তভাবে জোনা বয়ে চলেছে। কিন্তু জোনার সৌন্দর্য দেখার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। আমাদের অন্যান্য জায়গায় যাবার পরিকল্পনা রয়েছে। সুতরাং আমরা প্রকৃতির অতুলনীয় সৃষ্টি অপরূপ জোনাকে বিদায় জানিয়ে রওনা হলাম হুড্রুর দিকে।

সুমন্ত্র বসু (বয়স ১২)

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

গাছের পাতা, একসঙ্গে

পাতা দেখেছ আলাদা করে। নমুনায় দেখো একসঙ্গে থাকলে তাদের দেখতে কেমন হয়। একসঙ্গে থাকারও একটা বিশেষ আকার আছে। এই মিলে-মিশে থাকার বাঁধন দেখবার মতো। আকাশে পাখির ঝাঁক দেখলে বলতে পারো কোন্ পাখির দল যাচ্ছে, তেমন ভাবেই এই পাতার গোছা গোছা আকার দেখেও চিনে নিতে পারা যায় এরা কোন্ কোন্ গাছ।

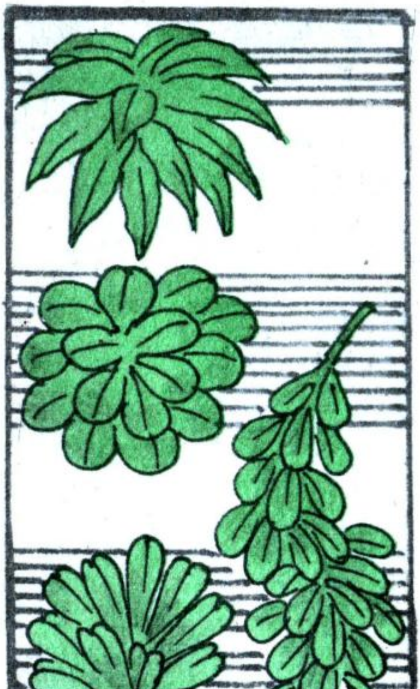

কারিগর

বাঁশের কাজ : কলমদান

জোগাড় করা জিনিস দিয়েই শুরু করো। মাপ অনুযায়ী বাঁশের টুকরো এক পাশে গিঁট রেখে কেটে তাকে মাঝ-বরাবর চিরে (১ নং ছবি) ফাঁকা দিকটায় প্লাই বা ম্যাসোনাইট বোর্ড দিয়ে ঢেকে দাও (২নং ছবি)।

এবার সামনের কাজের জন্যে বাঁশের পাতলা চাকা কেটে (৪নং ছবি) আর মণির জন্যে তার মাঝে পুঁতি বসাও। নাক আর কানের আকার মাফিক পাতি কেটে আঠা দিয়ে বসিয়ে নাও জায়গামতো। নাকের জন্যে পাতি একটু মোটা হবে। মুখের জন্যে গোল চাকাকে আধাআধি করে একটু তফাতে বসালেই কাজ শেষ।

জেনে রাখো—(১) পেরেক জোরে ঠুকলে বাঁশের গা ফাটবে। (২) চোখের চাকা বাঁশের গা অনুযায়ী ঢালু করে নিলে বসবে ভাল। (৫নং ছবি)। (৩) পেছনের বোর্ড বাঁশের থেকে লম্বা হলে দেওয়াল পরিষ্কার থাকবে। (৪) কাজটি ঝোলানোর জন্যে ফুটো করতে ভুলো না।

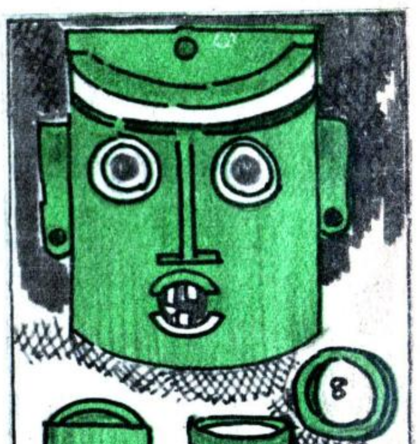

আজকের বিশ্বে কোন দেশই একা
নিজের অস্তিত্ব রক্ষা ক'রতে পারে না।
প্রত্যেক দেশকেই তার বিবেকসম্পন্ন
সহযোগীর অবিচ্ছিন্ন বিনিময়ের উপর আস্থা
রাখতে হয়। রাষ্ট্রের সংগে রাষ্ট্রের এই
সহযোগিতার মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়
পারস্পরিক বোঝাপড়া, বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব
এবং তখনই বিশ্বে গড়ে ওঠে
প্রগতি ও শান্তি।
সহযোগিতা ও বন্ধুত্বই হচ্ছে সাগর
পেরিয়ে দেশ-দেশান্তরের মধ্যে
মজবুত সেতু।
ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানী—
এক নির্ভরযোগ্য সহযোগী—

সহযোগিতা মৈত্রী গড়ে তোলে

ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানী
—এক নির্ভরশীল সহযোগী

ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানীর কনসুলেট জেনারেলের তথ্য ও সংবাদ বিভাগ
৯, হেস্টিংস পার্ক রোড, কলিকাতা-২৭ কর্তৃক প্রচারিত।

ANANDAMELA Regd No WB/CC 264 1 August 197

হাসছি মোরা,
হাসছি দেখ,
হাসছি মোরা
আহ্লাদি,
এই বছরে
বেজায় মজা,
আয়না সবাই
পাল্লা দি।

ছোটদের বছরের
একটি নিত্য সঙ্গী

সুরভিত
অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

GD 50 YEARS
1929-1978

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বোরোলীন হাউস কলকাতা ৭০০ ০০৩

GD 315